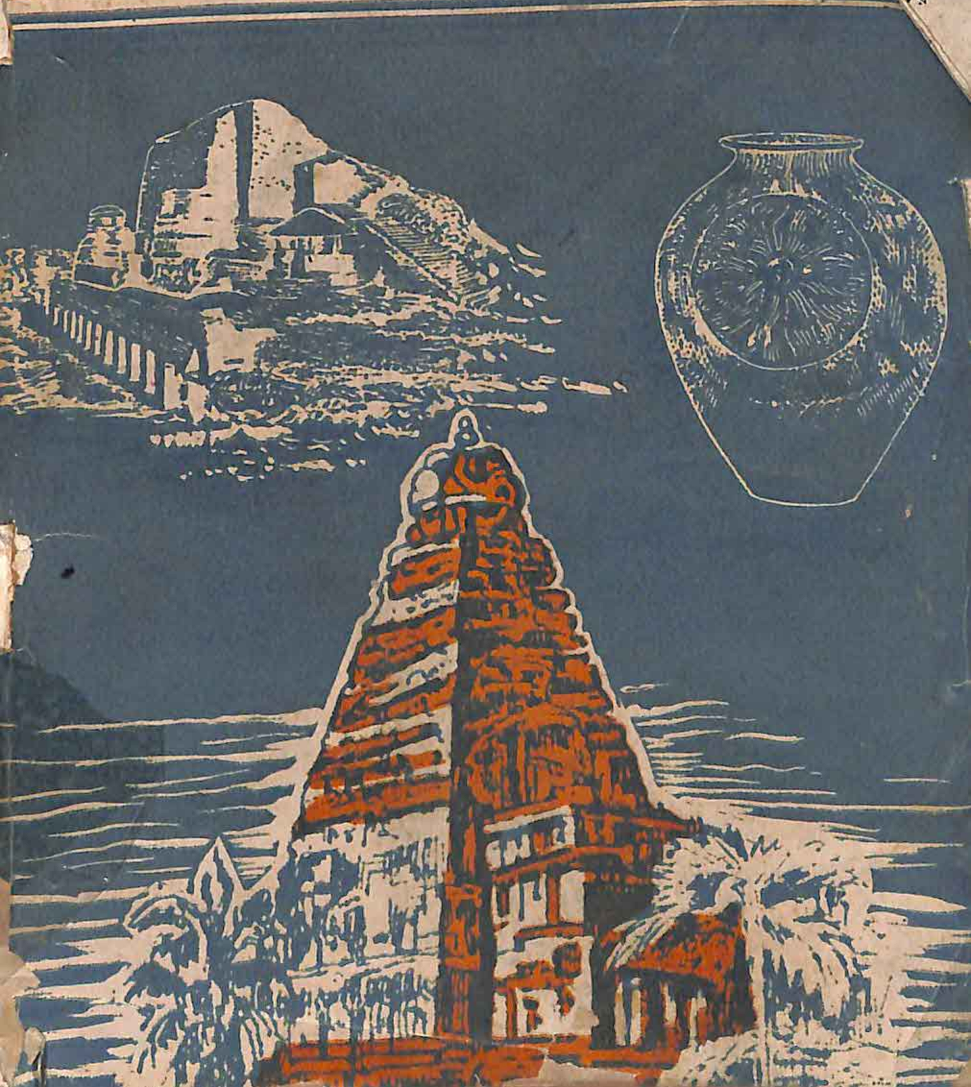
ঐতিহ্য পরিচয়

f Sec
lass

সপ্তম
টির





Recommended by the West Bengal Board of Sec
Education as a Text Book of History for Class
vide TB No /VII/H/81/61 dated 8.1.81.

ইতিহাস পরিচয়

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

নিখিল বাংলা বিদ্যালয় অশিক্ষক কর্মী সংস্থা



বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির
৭-বি কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯



শ্রীঅশোককুমার ভূঁইয়া
ও
ড: সুধাংশুবিকাশ সাহা
কর্তৃক সংকলিত

প্রকাশক:
এস. দাস
বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির
৭-বি কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণে: এস, অ্যাণ্টুল এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৯১, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে অশিক্ষক কর্মীদেরও কিছু ভূমিকা থাকে। রাজ্যের অশিক্ষক কর্মীদের একমাত্র সংগঠন নিখিল বাংলা বিদ্যালয় অশিক্ষক কর্মী সংস্থা তাই শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

এই সংস্থা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস "ইতিহাস পরিচয়" রচনায় ব্রতী হয়েছে। বইটির রচনা পরিপাট্য, ছাপার উৎকর্ষ ও ছবির অপরূপ সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করবে।

ভাল বই হিসেবে পাঠ্য করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং ইতিহাসের শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রতি প্রার্থনা জানাচ্ছি।

আশাকরি এবিষয়ে সকলের আশীর্বাদ ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবনা। নমস্কারান্তে—

শ্রীকার্তিকচন্দ্র কোলে
সভাপতি
নিখিল বাংলা বিদ্যালয়
অশিক্ষক কর্মী সংস্থা

শ্রীগৌরাঙ্গ ভাদুরী
সাধারণ সম্পাদক
নিখিল বাংলা
বিদ্যালয় অশিক্ষক কর্মী সংস্থা



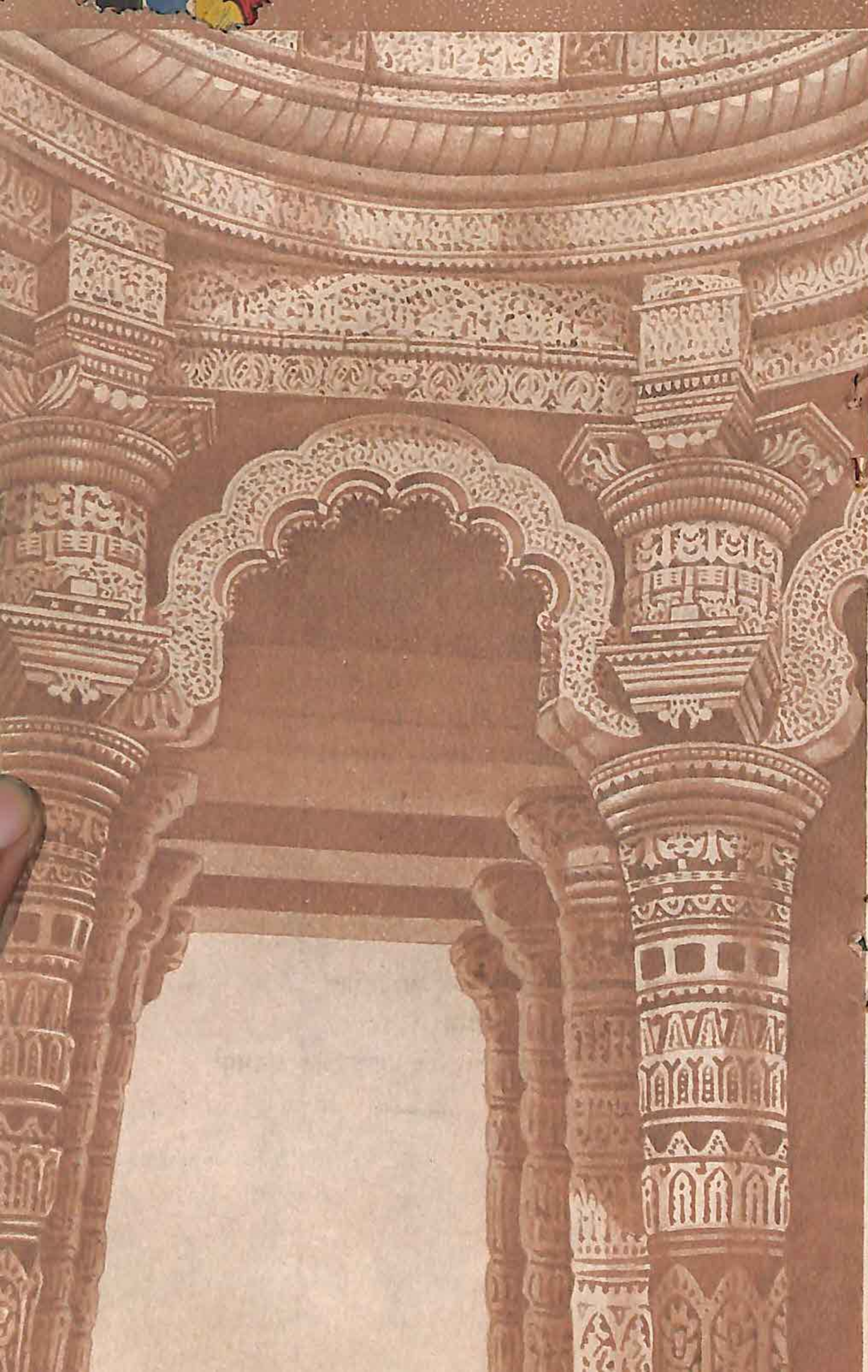


প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৭৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৯৮৩

তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৮৪

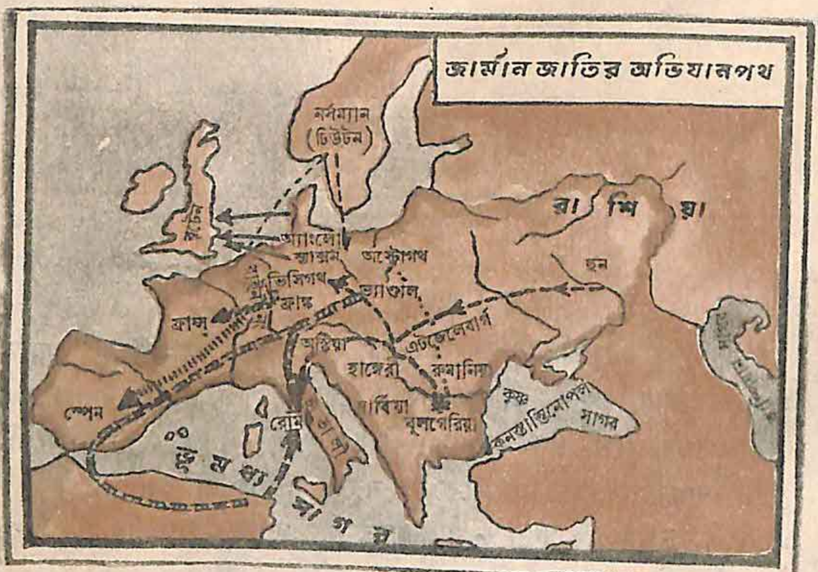
সূচীপত্র



১ মধ্যযুগ বলতে কি বোঝায়?

মানবজাতির ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। মানবসভ্যতার গোড়া থেকে রোম সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত (৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) সময়কালকে বলা হয় প্রাচীন যুগ। রোম সাম্রাজ্যের পতন থেকে যে যুগের সূত্রপাত হয় তাকে বলে মধ্যযুগ। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্তীয় সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে এই যুগের অবসান ঘটে।

রোম সম্রাটের সিংহাসনচ্যুতি, নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ঃ ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ওডোএসার নামে এক জার্মান সেনাপতি রোমের শেষ সম্রাটকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে রোম অধিকার করে। এইভাবে ইতিহাসে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়। রোম সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল দাসপ্রথা। দাস-মালিকরা দাসদের ওপর নানারকম অত্যাচার করত। ফলে দাস-শ্রমের ওপর ভিত্তি করে রোমে যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল তা সহজেই ভেঙে পড়ে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে দাস-ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে রোমে কৃষিকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও কৃষির অবনতি ঘটে। দাস-মালিকরা দাসদের খাদ্যসংস্থানে অসমর্থ হয়ে তাদের ক্ষেতখামার ও জোতজমিগুলি দাসদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। এইভাবে রোমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সামন্ততন্ত্রের দিকে মোড় নেয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে জার্মান জাতিদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে রোমের সামরিক সংগঠন ভেঙে পড়ে। তখন ভূস্বামীরা আত্মরক্ষার তাগিদে নিজেরাই বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। কখনও-বা যুদ্ধে জার্মানদের হারিয়ে দেয়, কখনও-বা তাদের সঙ্গে



বোঝাপড়া করে তাদের মধ্যে জোত-জমি বিলিয়ে দেয়। এইভাবে দাস-মালিকরা সামন্তে পরিণত হয়। রোমের দাসভিত্তিক অর্থনৈতিক



ও সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং দাসদের পরিবর্তে দেখা দেয় একদল অর্ধ-স্বাধীন মানুষ। এরাই ভূমিদাস নামে পরিচিত হয়।

এই ভূমিদাস-প্রথাকে কেন্দ্র করে ইউরোপে যে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকেই বলে সামন্ততন্ত্র।

খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে জার্মানদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত স্বত্ব ছিল না। যৌথগ্রাম প্রথায় এরা ফসল উৎপাদন করত যদিও পশু-পালনই ছিল এদের প্রধান জীবিকা। ক্রমে এরা কৃষি ও চাষবাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। জার্মানরা বিভক্ত ছিল অসংখ্য গোত্রে। গোত্রগুলি প্রথমে যৌথভাবে জমি চাষ করত। পরবর্তী কালে গোত্রগুলি আবার কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হয়। পরিবারগুলি তখন স্বতন্ত্রভাবে চাষবাস করতে থাকে।

জার্মানদের মধ্যে ছিল গণতন্ত্র। প্রত্যেক গোত্রের এক-একটি গণপরিষদ ছিল। গণপরিষদের ক্ষমতা ছিল অসীম। যুদ্ধবিগ্রহের সময় গণপরিষদ সেনাপতি নিয়োগ করত। এরা ডিউক নামে অভিহিত হত। কালক্রমে এই ডিউকদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, এবং এদের পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। কয়েকটি গোত্র মিলেমিশে গঠিত হত জাতি। এই জাতির প্রধান ছিলেন কোনাং বা রাজা।

জার্মানদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির কোন বালাই ছিল না। তাদের দিনরাত কাটত যুদ্ধবিগ্রহে। রোমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে আদর্শ ও ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল বর্বরদের আক্রমণে তা বিনষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে এই বর্বর জার্মানরাই খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে এদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনে এক বিরাট ওলটপালট ঘটে। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়। তার স্থান দখল করে খ্রীষ্টধর্ম ও বাইবেলের শিক্ষা। বাইবেলকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে ইউরোপে গড়ে ওঠে এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা। মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ বা গীর্জাই ছিল এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র।

ভারতে মধ্যযুগ—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন: ভারতের মধ্যযুগের সূত্রপাত হয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর

থেকে। সামন্ততন্ত্রের চিহ্নগুলি এই সময় থেকেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে হূন ও বর্বর জাতিদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য যখন বিপর্যস্ত, ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্য তখন গৌরবের শীর্ষ চূড়ায়। গুপ্ত রাজাদের সুশাসনে সমগ্র আর্যাবর্ত ঐক্যবদ্ধ হয়। সমগ্র দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত অশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু রোমের ন্যায় গুপ্ত সাম্রাজ্যও হানাদার হূনদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। হূনদের একটি শাখা ভারত আক্রমণ করে। এদের বলা হত 'শ্বেত হূন'। এই হূনদের নেতা ছিলেন তোরমান ও মিহিরকুল। উভয়েই ছিলেন খুব নৃশংস ও শক্তিশালী যোদ্ধা। তোরমান পশ্চিম ভারতের এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে হূন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। মিহিরকুল তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন পাঞ্জাবের শাকল বা শিয়াল-কোটে। হূন আক্রমণ প্রথম প্রতিরোধ করেন সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত। স্কন্দগুপ্তের আমলে হূনরা পুনরায় গুপ্ত সাম্রাজ্যে হানা দেয়। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত তাদের শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন (৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে)। অতঃপর ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মান্দাশোরের রাজা যশোধর্মনের হাতে মিহিরকুল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কিন্তু যশোধর্মনের মৃত্যুর পরেও বেশ কিছুকাল হূন আক্রমণ অব্যাহত ছিল।

মধ্যযুগের সময়রেখাঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ বলে ধরা হয়। মধ্যযুগে পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য প্রায় এক। পৃথিবীর প্রায় সকল অংশেই এই সময় রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল সামন্ততন্ত্র। কিন্তু দেশভেদে এই সামন্ততন্ত্রের মধ্যেও পার্থক্য ছিল। যেমন ইউরোপে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ভূমিদাসপ্রথা চালু ছিল, ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার অনেক তফাত। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্কী নামে এক জাতির হাতে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকেই মধ্যযুগের অবসান বলে ধরা হয়। এই সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে ইতালিতে এক

নবজাগরণ হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারই ছিল এই নবজাগরণের মূল কথা। এই ইউরোপীয় নবজাগরণের মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে এবং তার স্থলে উদ্ভব ঘটে ধনতন্ত্রের। এইভাবে ইতিহাসে শুরু হয় আধুনিক যুগ।

কালবিভাগ কৃত্রিম : কোন কোন ঐতিহাসিক যে রকম যথেচ্ছভাবে কালবিভাগ করেছেন তা ভুল ও কৃত্রিম। এভাবে ইতিহাসের কালবিভাগ করা যায় না। কারণ পৃথিবীর সকল দেশেরই সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ও রদবদল অতি ধীর ও মন্থর। পুরানো রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ভেঙে নতুন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে বেশ কিছু সময় লাগে। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণের বেলাতেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল।

মধ্যযুগ সর্বত্র এক নয় : পৃথিবীর সব দেশে একই সময়ে মধ্যযুগ শুরু হয়নি। সকল দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ঐতিহাসিক পটভূমিও এক নয়। এক এক দেশের ইতিহাস সেই দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের যুগে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাস ঘটেছিল, ভারত চীন প্রভৃতি এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তার বেশ কিছু পার্থক্য আছে। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সর্বত্র একই ধাঁচে গড়ে ওঠে না। অসম ও বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন মানবেতিহাসের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী

(ক) মধ্যযুগ বলতে কি বোঝায় ?

(খ) ওডোএসার কে ?

(গ) তোরমান ও মিহিরকুল কে ?

(ঘ) হুনরা ভারতে কোন সম্রাটের কাছে পরাজিত হন ?

(ঙ) কোন সময়কে মধ্যযুগ বলে ধরা হয় ?

(চ) কত খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

(ক) রোমে দাসপ্রথা সম্বন্ধে কি জান ?
(খ) জার্মানদের সমাজজীবন কিরূপ ছিল ?
(গ) 'কালবিভাগ কৃত্রিম' একথা কেন বলা হয় ?
(ঘ) ভূমিদাস কাকে বলে ? সামন্ততন্ত্র কি ?

৩। রচনাত্মক

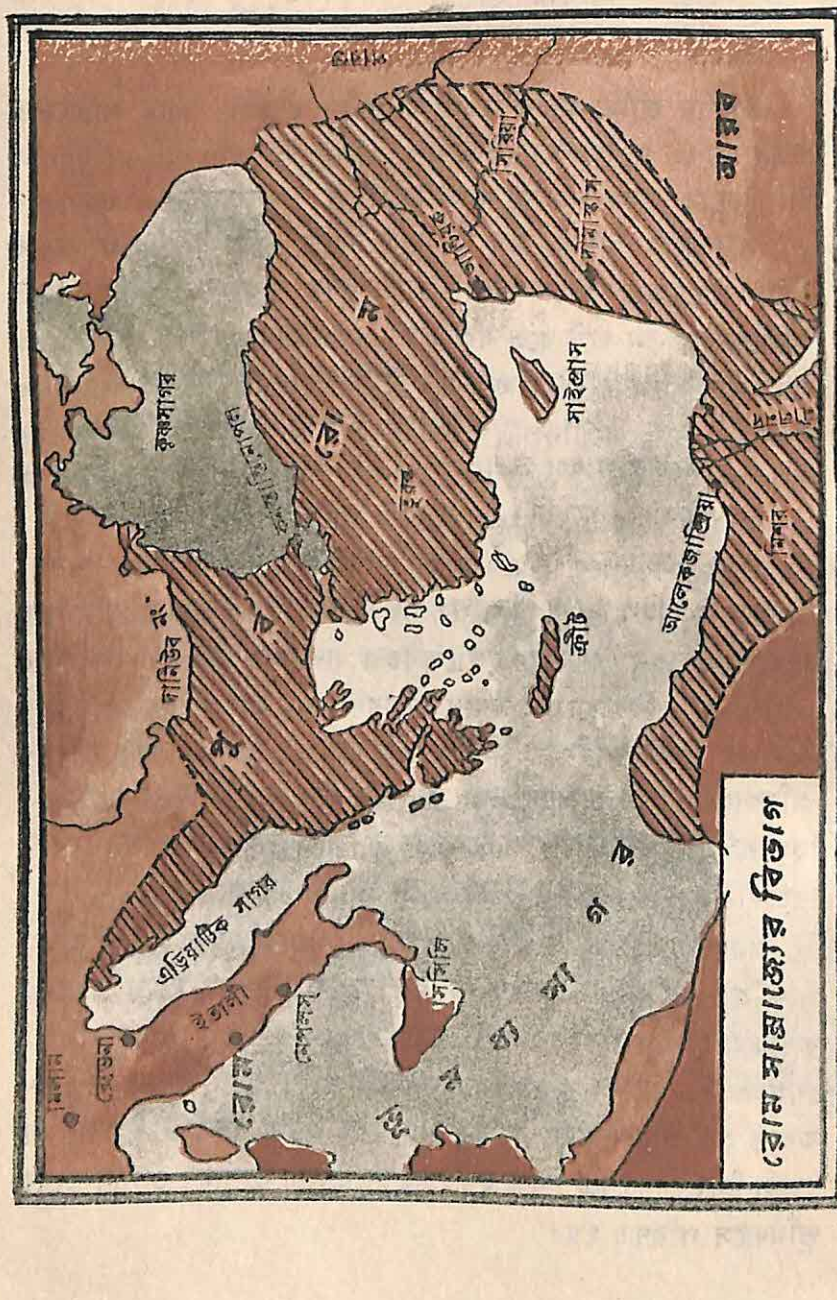
(ক) জার্মান রাজনৈতিক জীবন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় দাও।
(খ) ভারতে কিভাবে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয় ?
(গ) ইউরোপের নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধে কি জান ?
(ঘ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন কিভাবে হয় ?
(ঙ) মধ্যযুগের সময়রেখা সম্বন্ধে কি জান ?



২ ইউরোপে মধ্যযুগ

জার্মান জাতি কর্তৃক রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ, রোম সাম্রাজ্যের পতন (৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার এক বিশাল অংশ জুড়ে রোম সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। প্রায় চারশো বছর ধরে এই সাম্রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সাধারণতঃ ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে বলে ধরা হয় (১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই রোম সাম্রাজ্যের পতন একদিনে ঘটেনি। দীর্ঘকাল ধরেই রোমের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকেই রোমের শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে এসেছিল। এর গতি ছিল এত ধীর ও মন্থর যে তাদের সাম্রাজ্যের এই ভাঙন রোমের অধিবাসীদের নজরে পড়েনি। সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে রোমে দেখা দিয়েছিল নানা বৈষয়িক সমস্যা। জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছিল অথচ শ্রমিকদের মজুরি ছিল খুবই কম। মুনাফাখোরদের হাতে ছিল খাদ্যশস্য, পশম ও স্বর্ণমুদ্রার একচেটিয়া অধিকার। এই নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগের অন্ত ছিল না। প্রদেশগুলিতে বিদ্রোহ প্রায় লেগেই ছিল। কিন্তু রোমের অধিকাংশ নাগরিক সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ এইসব সমস্যার প্রতি ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা খেয়েদেয়ে, আমোদ-আহ্লাদ করে কিংবা থিয়েটার ও বাঘ-সিংহের লড়াই দেখে দিব্যি দিন কাটাত।

সম্রাটের অবিরাম ও অবিশ্রান্ত যুদ্ধে রোমের হাজার হাজার যুবক প্রাণ হারিয়েছিল। সামরিক বাহিনীতে যোগদানের দরুন রোমের কৃষকেরা হয়েছিল সর্বস্বান্ত। কৃষকদের ওপর করের বোঝাও ছিল। শেষ পর্যন্ত এইসব কৃষকদের জোতজমি ছেড়ে হয় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয় আর নয়তো ধনী ভূস্বামীদের কাছে খাদ্য ও বাসস্থানের বদলে নিজেদের বেচে দিতে হয়। এইভাবে এরা ভূস্বামী ও সামন্তদের ভূমিদাসে পরিণত হয়।



রোম সাম্রাজ্যের বিভাগ

এইভাবে রোম সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যের গোড়ার দিকে সম্রাটরা ছিলেন দক্ষ ও সুশাসক। কিন্তু শেষের দিকে সম্রাটদের অধিকাংশই ছিলেন নামেমাত্র সম্রাট। এদের জীবনমরণ নির্ভর করত প্রীটোরীয় দেহরক্ষীদের মর্জির ওপর। একসময় রোম সীমান্ত ছিল সুরক্ষিত। সম্রাট অগস্টাস রোম সীমান্তে কতকগুলি দুর্গ তৈরি করে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। উত্তরের বর্বর জার্মান জাতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই রোম সাম্রাজ্যে হানা দেয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বর্বর জাতিদের আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হয়। কিন্তু ক্রমেই সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে এদের চাপ বাড়তে থাকে। রোমক সৈন্যদের সঙ্গে এইসব বর্বর জাতির ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়। এদিকে রোমের সামরিক সংগঠন ভেঙে পড়ে। সম্রাট অগস্টাস যেসব দুর্গ তৈরি করেছিলেন সেইসব দুর্গ ভেঙে বর্বর জাতিরা রোম সাম্রাজ্যের ভেতর ঢুকে পড়ে। রোমের ভাড়াটে সৈন্যদের পক্ষে এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা আর সম্ভব হয় না। অবশেষে কয়েকটি জার্মান গোষ্ঠীকে সাম্রাজ্যের ভেতরে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। শীঘ্র অন্যেরা তাদের অনুসরণ করে। এইসব বর্বর জার্মান জাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গথ্, ভ্যান্ডল, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি।

হুনদের চাপঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে হুনরা রোম সাম্রাজ্যে হানা দেয়। হুনরা ছিল মধ্য এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। যুদ্ধ ছিল তাদের পেশা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এরা ঘুরে বেড়াত দেশ-দেশান্তরে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীন সীমান্ত থেকে এরা পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। একটি দল ভারতে আসে, আর একদল এগিয়ে যায় ইউরোপের দিকে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে এরা এসে পৌঁছয় দানিয়ুব নদীর তীরে। এখানে তখন বাস করত গথ নামে এক জাতি। হুনদের চাপে গথরা রোম আক্রমণ করে। ভ্যালেন ছিলেন তখন রোমের সম্রাট। সম্রাট ভ্যালেন এই আক্রমণ রোধের চেষ্টা করেন

কিন্তু ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এক যুদ্ধে তিনি মারা যান। এই সময়ে রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম—এই দুভাগে বিভক্ত হয়। বর্বর জাতিদের ক্রমাগত হানায় অতিষ্ঠ হয়ে সম্রাট কন্‌স্টানটাইন বাইজান্তিয়ামে এক নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে শহরটির নামকরণ হয় কনস্টানটিনোপল।

রোম সাম্রাজ্যের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে গথরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গথদের নেতা ছিলেন অ্যালারিক। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালারিকের নেতৃত্বে গথরা রোম আক্রমণ করে এবং রোম নগরী দখল করে। কিন্তু গথরা রোম সাম্রাজ্য লুটপাট বিশেষ করেনি। এরপর আসে ভ্যান্ডালরা। ভ্যান্ডালরা রোমে ধ্বংসের তান্ডবলীলা



অ্যালারিকের রোম আক্রমণ

চালায় এবং রোমের যা কিছু মহান ঐতিহ্য সবকিছু ধ্বংস করে। ভ্যান্ডালদের রাজা ছিলেন গায়সেরিক। ৪২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

ভ্যান্ডালদের স্পেন থেকে আফ্রিকায় স্থানান্তরিত করেন। ৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্থেজ দখল করে তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন এবং রোমের আনুগত্য অস্বীকার করেন। পূর্ব রোম সম্রাটগণ কর্তৃক তাঁকে উৎখাতের সব প্রচেষ্টা গায়সেরিক ব্যর্থ করে দেন। জার্মানদের মধ্যে একমাত্র তিনি একটি শক্তিশালী নৌবহর নির্মাণ করেন কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল রোম অধিকার। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোম দখল করেন। এক পক্ষ কাল ধরে তাঁর সৈন্যরা রোম দখল করে রাখে এবং বহু মূল্যবান শিল্পদ্রব্য লুঠ করে।

হূনদের নেতা ছিলেন অ্যাটিলা। এশিয়া থেকে দানিয়ুব পর্যন্ত এক বিশাল অংশে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন। শোনা যায় অ্যাটিলা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। রোম সাম্রাজ্যের দুই অংশকেই তিনি করদানে বাধ্য করেন। কিন্তু এক সময় পূর্ব ও পশ্চিম —রোম সাম্রাজ্যের এই দুই অংশই অ্যাটিলাকে করদানে অস্বীকৃত হয়। অ্যাটিলা তখন রোম আক্রমণ করেন। কিন্তু গথ ও রোমানদের সম্মিলিত বাহিনীর হাতে অ্যাটিলা পরাজয় বরণ করেন। ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে এক যুদ্ধে অ্যাটিলা পরাজিত হন এবং সন্ধি করে নিজরাজ্যে ফিরে যান। অ্যাটিলার মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে যায়।

হূন আক্রমণ প্রতিরোধে জার্মান জাতিদের কৃতিত্ব অসাধারণ। ৪০২ খ্রীষ্টাব্দে রোম সম্রাট র‍্যাভেনায় পালিয়ে যান। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ওডোএসার নামে এক জার্মান সেনাপতি রোমের শেষ সম্রাট রমুলাস অগাস্টুলাসকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। ওডোএসার প্রায় বছর দশেক রোম শাসন করেন। এরপর ভিসিগথদের রাজা থিয়োডরিক রোম আক্রমণ করে তাঁর খাবার টেবিলে ওডোএসারকে হত্যা করেন এবং রোম দখল করে ইতালিতে একটি গথিক রাজ্য গড়ে তোলেন।

রোমের আইনকানুন ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সংরক্ষণঃ রোমের শাসনাধীনে গোটা রোম সাম্রাজ্যে গড়ে উঠেছিল এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য।

বর্বর জাতিদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোমের এই রাষ্ট্রীয় ঐক্যে চিড় খায় এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়। রোম সাম্রাজ্যের নানা অংশে বর্বর জাতিরা পৃথক পৃথক রাজ্য গড়ে তোলে। ভিসিগথরা স্পেনে, ফ্রাঙ্ক জাতি গল বা ফ্রান্সে, অস্ট্রোগথরা ইতালিতে রাজ্য গড়ে তোলে। এইভাবে গোটা ইউরোপ জুড়ে এক রাষ্ট্রের বদলে গড়ে ওঠে পৃথক পৃথক জাতি ও রাষ্ট্র। রোমের অতীত গৌরব ও কীর্তি বিলুপ্ত হলেও কিন্তু জার্মানরা যে রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবকিছু পরিত্যাগ করেছিল তা নয়। রোমক সভ্যতার অনেক কিছু তারা গ্রহণ করেছিল এবং রোমের আইনকানুন, শাসনব্যবস্থা, শিল্পকলা ও স্থাপত্যবিদ্যা ইত্যাদি শিখে নিয়েছিল। ফলে জার্মান ও রোমক—এই দুই সভ্যতা মিলেমিশে গড়ে তুলেছিল এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

জার্মানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনঃ রোমানরা জার্মানদের বর্বর বলে অভিহিত করেছে কিন্তু এরা যে মোটেই বর্বর ও অসভ্য ছিল না দুটি বিবরণ থেকে আমরা তা জানতে পারি। এই দুটি বিবরণের রচয়িতা জুলিয়াস সীজার ও ও রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস। সীজার ও ট্যাসিটাস উভয়েই বর্বর জাতিদের জীবনযাত্রা—সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য রেখে গিয়েছেন। জার্মানদের শরীর ছিল দীর্ঘ ও সুগঠিত। চুল তামাটে। চোখ নীল। এরা শহর গড়তে জানত না। উন্মুক্ত প্রান্তরে নদী বা ঝরণার ধারে ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত গ্রামে বাস করত। এদের ঘরদোর ছিল কাঠের ও মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। শিকার ও পশুপালন ছিল এদের প্রধান জীবিকা। মাছ-মাংস, শাক-সবজি ও আপেল ছিল প্রধান খাদ্য। গোরু, ঘোড়া, ভেড়া ও ছাগল ছিল গৃহপালিত পশু। চাষবাসের কাজও সামান্য করত। ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে এরা ঘুরে বেড়াত। রথের দৌড় ছিল এদের প্রধান ক্রীড়া। যুদ্ধ ছিল এদের নেশা ও পেশা। পরে ঢাল ও বর্শা নিয়ে এরা যুদ্ধ করত। অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় বাহিনীই এদের ছিল।

জার্মানরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি দল বা গোত্র আবার বিভক্ত ছিল কয়েকটি পরিবারে। যৌথভাবে দলের কাজকর্ম পরিচালিত হত। সকলের ঊর্ধ্বে ছিলেন রাজা। তারপর অভিজাতগণ। তারপর সাধারণ লোক। সকলের নিচে ছিল ভূমিদাস। বড় দলকে একহাজার যোদ্ধা যোগাতে হত, ছোটদলকে একশ। বড় বড় দলে পঞ্চাশ হাজার থেকে আশি হাজার পর্যন্ত লোক থাকত। যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার থেকে বিশ হাজার। দলের প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে গঠিত হত জনপরিষদ। এই পরিষদের ক্ষমতা ছিল অবাধ। দলপতি নির্বাচন, যুদ্ধ ও সন্ধি ঘোষণার অধিকারও তাদের ছিল। জার্মানরা ধর্মে ছিল পৌত্তলিক।

জার্মানদের রোমসাম্রাজ্যে বসতি ঃ পূর্বে বলা হয়েছে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে যেসব বর্বর জাতি রোম সাম্রাজ্যে হানা দেয় তাদের অনেককে রোম সম্রাটরা রোম সাম্রাজ্যে বসবাসের অনুমতি দেন। অনেকে রোমের সেনাবাহিনীতেও যোগ দেয়। পরবর্তী কালে রোমের সীমান্তরক্ষার দায়দায়িত্ব এদের ওপর এসে পড়ে। রোম তার নিজের স্বার্থ বিশেষত হূন আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদে এইসব বর্বর জাতির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়।

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ঃ ধর্মে পৌত্তলিক হলেও জার্মান জাতি ধীরে ধরে খ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শে আসে এবং এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। রোম সম্রাটরা দুর্ধর্ষ জার্মানদের দমন করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রেরণ করেন। কয়েকটি জার্মান জাতি অচিরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। খ্রীষ্টধর্ম জার্মানদের জীবনে এক গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই ধর্মের সংস্পর্শে এসে বর্বর জার্মানরাও ধীরে ধীরে সভ্য হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী

(ক) কত খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ?

(খ) অ্যালারিক কে ? কত খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোম দখল করেন ?

(গ) ভ্যাণ্ডালদের নেতা কে ছিলেন ? তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে রোম দখল করেছিলেন ?

(ঘ) অ্যাটিলা কে ছিলেন ? কাদের হাতে তিনি পরাজয় বরণ করেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

(ক) রোমে কি কি বৈষয়িক সমস্যা ছিল ?

(খ) বর্বর জাতিদের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা কিভাবে হয় ?

(গ) হুন জাতি সম্বন্ধে কি জান ?

(ঘ) গায়সেরিকের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(ঙ) রোমের শেষ সম্রাট কে ? কোন সেনাপতি তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন ?

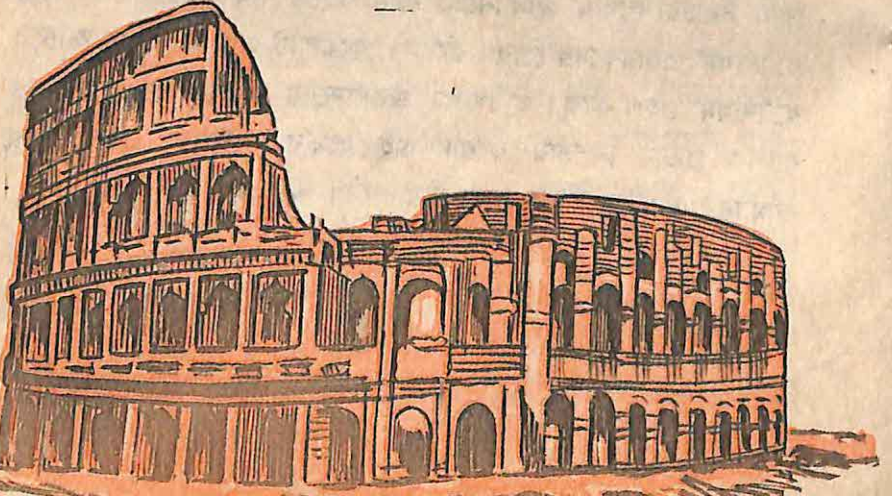
৩। রচনাত্মক

(ক) রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি সংক্ষেপে লেখ।

(খ) হুনরা কিভাবে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে ?

(গ) অ্যাটিলা সম্বন্ধে কি জান ? রোমের ঐক্যে কিভাবে চিড় খায় ?

(ঘ) জার্মানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।



৩ ইউরোপে অন্ধকার যুগের কিংবদন্তী

(খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৭ম শতক)

বর্বর জাতিদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল বর্বর জার্মান জাতিদের হানায় সেই ঐতিহ্যময় রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবসান ঘটেছিল। বস্তুত রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপের বর্বর জাতিগুলির বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু স্মৃতিচিহ্ন তার অধিকাংশই বর্বর জাতিরা ধ্বংস করেছিল। ভ্যান্ডাল ও গথদের দ্বারা রোম নগরী অধিকারের ফলে রোমের যা কিছু ঐতিহ্য তার প্রায় সবই ধ্বংস হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে আরও কয়েকটি বর্বর জাতি রোম আক্রমণ করে। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানিতে এরা এত বেশী লিপ্ত হয়ে পড়ে যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি নজর দেবার কোন অবকাশ এদের ছিল না। কিছু কালের মধ্যেই রোম নগরীর চরম দুর্দশা শুরু হয়। রোমে যেসব বিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কয়েকশো বছর ধরে গড়ে উঠেছিল সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয় ধূলিসাৎ হয়। শিক্ষকরা বেকার হয়ে পড়েন এবং তাঁদের অনশনে প্রাণত্যাগ করতে হয়। ইতালির জমকালো প্রাসাদ ও ভিলাতে বাস করত রোমের ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিরা। বর্বর জাতিরা এইসব প্রাসাদ ও ভিলা থেকে এদের উৎখাত করে এবং এগুলি দখল করে নেয়। রোম সাম্রাজ্যের সুন্দর সুন্দর পথঘাট, সেতু, প্রাসাদ, অট্টালিকা সবকিছুই বর্বর জাতিদের হাতে ধ্বংস হয়। রোম সভ্যতার কোন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য এদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে সপ্তম শতক—সুদীর্ঘ এই তিনশো বছর ধরে পশ্চিম ইউরোপে নেমে আসে এক অন্ধকার যুগ। অন্ধকার কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যা কিছু আলোকশিখা বর্বর জাতিরা তার সবকিছু এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়েছিল।

ধর্মীয় চেতনা ও মঠের শিক্ষাঃ কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যেও জ্বলে উঠেছিল আবার এক নতুন আলোর শিখা। রোম সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু ঐতিহ্য লুপ্ত হয়, তার বদলে ইউরোপে গড়ে ওঠে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মানুষের মনে গড়ে ওঠে এক নতুন নীতিবোধ ও আদর্শ। এই নীতিবোধ ও আদর্শ গড়ে উঠেছিল খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে। যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় শিষ্যরা খ্রীষ্টের মানবতা, মানবপ্রেম ও ভালবাসার বাণী দিকে দিকে প্রচার করতে থাকে। রোমে এবং রোম সাম্রাজ্যের নানান স্থানে ধীরে ধীরে খ্রীষ্টের বাণী ছড়িয়ে পড়ে। রোম সম্রাট এবং রোমের ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিরা প্রথমে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিরূপ ছিল। কিন্তু রোমের সাধারণ মানুষ বিশেষত ক্রীতদাসরা খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যে খুঁজে পায় তাদের বেঁচে থাকার আশ্বাস। কিছুকালের মধ্যেই রোমের নিপীড়িত মানুষেরা দলে দলে এসে খ্রীষ্টের শিষ্যদের সমীপে উপস্থিত হতে থাকেন। এইভাবে রোমে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলে। সম্রাটরাও আর এ ধর্মকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। নানান কারণে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁরাও আকৃষ্ট হন। রোম সম্রাট কন্সটানটাইন খ্রীষ্টধর্মকে রোমের অন্যতম ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেন। রোমে গড়ে ওঠে খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠান চার্চ বা গীর্জা। চার্চের প্রধান পুরোহিতকে বলা হত পোপ। পোপ ছিলেন খ্রীষ্টধর্মের জগতের গুরু। খ্রীষ্টধর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি। অবশেষে কেবল রোমানদের মধ্যেই নয়, বর্বর জাতিদের মধ্যেও খ্রীষ্টধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। খুব শীঘ্রই এরা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ফ্র্যাঙ্ক প্রভৃতি কয়েকটি জাতি এই ধর্মে দীক্ষিত হয়। এদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনধারারও পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে অসভ্য ও বর্বর জার্মান জাতিরাও ধীরে ধীরে সভ্য হয়ে ওঠে। ধর্মও হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। নানান স্থানে গড়ে ওঠে চার্চ বা গীর্জা। কালক্রমে এই চার্চ বা গীর্জাই

মধ্যযুগে প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাইবেলের পবিত্র বাণী মধ্যযুগীয় অন্ধকারে মানুষের মনে সঞ্চার করে আশার আলো। কেবল চার্চ নয় এই সময় ইউরোপের নানান স্থানে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য মঠ। এইসব মঠে বাস করতেন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা। মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত অ্যাবট। মধ্যযুগীয় অন্ধকারে এই মঠগুলি ছিল শিক্ষার এক কেন্দ্র। এইসব মঠে নানান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। গোড়ার দিকে মঠের জীবন ছিল খুব কঠোর। কিন্তু কালক্রমে মঠবাসীদের জীবনে আসে প্রচুর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং তারা আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু এই মঠগুলিকে কেন্দ্র করে জ্বলে ওঠে শিক্ষার আলো এবং কালক্রমে মঠগুলি এক-একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই মঠকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়।

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবঃ অতএব মধ্যযুগকে পুরোপুরি অন্ধকারের যুগ বলা যায় না। অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার অন্ধকারের মধ্যেও এ যুগে জ্বলে উঠেছিল জ্ঞান ও শিক্ষার আলো। খ্রীষ্টধর্ম মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছিল এক নতুন আশা ও উদ্দীপনা। উদ্বুদ্ধ করেছিল এক নতুন মানবতাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এযুগের কয়েকজন মনীষীর অবদানও কম নয়। এই মনীষীদের বলা হত স্কুলমেন। স্কুলমেনদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল ফ্রান্সের পীটার অ্যাবেলার্ড, জার্মানীর অ্যালব্যার্টাস ম্যাগন্যাস, ইংলন্ডের রজার বেকন এবং ইতালির বিখ্যাত কবি দান্তে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান ক্ষেত্রে এঁদের ছিল বিপুল উৎসাহ।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী**

(ক) মধ্যযুগকে কেন 'অন্ধকার যুগ' বলা হয় ?

(খ) ইতালীর প্রাসাদ ও ভিলাতে কারা বাস করত ?

(গ) চার্চ কাকে বলে ? এর কাজ কি ছিল ?

(ঘ) অ্যাবট কাকে বলে ?

(ঙ) বর্বর জাতিদের হাতে রোমের শিক্ষকরা কিভাবে নাজেহাল হয়েছিলেন ?

২। **উত্তরভিত্তিক ও রচনাত্মক**

(ক) রোমের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে ধ্বংস হয় ?

(খ) মধ্যযুগে মানুষের নীতিবোধ ও আদর্শ কিভাবে গড়ে উঠেছিল ?

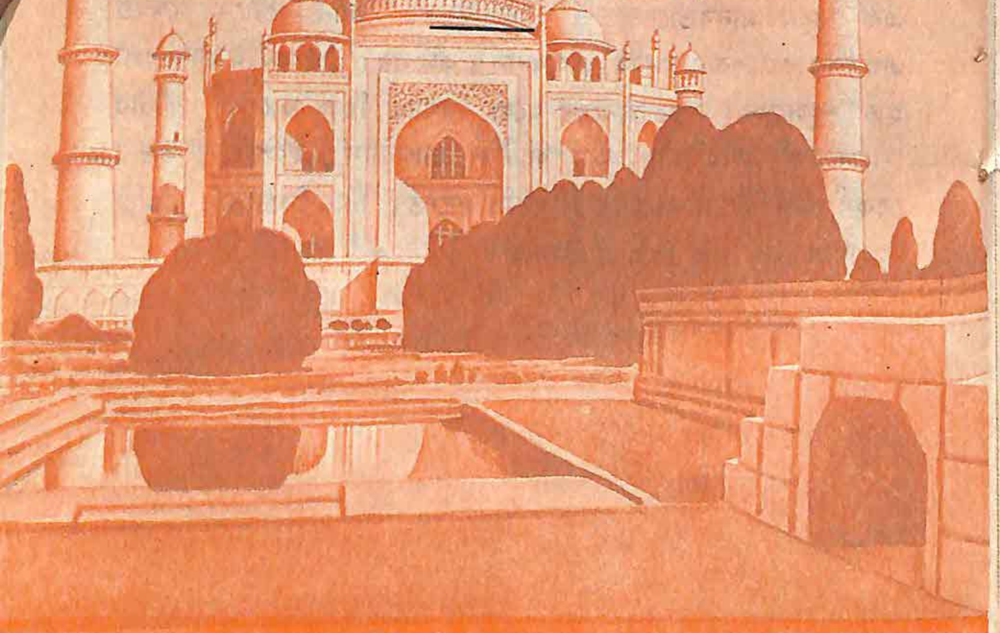
(গ) মধ্যযুগে মানুষের মনে খ্রীষ্টধর্ম কিভাবে প্রভাব-বিস্তার করে ?

(ঘ) মধ্যযুগের চার্চ ও মঠগুলি কিভাবে শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে ?

(ঙ) মধ্যযুগের কয়েকজন মনীষীর নাম কর।

(চ) মধ্যযুগে মানুষের মনে ধর্মীয় চেতনা কিভাবে গড়ে ওঠে ?

(ছ) কোন সম্রাট খ্রীষ্টধর্মকে স্বীকৃতি দেন ? এই ধর্ম মধ্যযুগের মানুষের নৈতিক-চরিত্র গঠনে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ?



৪ বাইজান্তীয় সভ্যতা

কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা ও খ্রীষ্টধর্মের স্বীকৃতি ঃ জার্মান ও হূন আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ক্রমে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। বিশেষত বর্বর জাতির ক্রমাগত হানায় রোমের উত্তর সীমান্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে, রোম সৈন্যদের পক্ষে তাদের অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয় না। রোমের ভাড়াটে সৈন্যদের পক্ষেও হানাদারদের বাধা দেওয়া সম্ভব ছিল না। অবশেষে রোম সম্রাটরা কয়েকটি জার্মান জাতিকে তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাসের অনুমতি দেন। বর্বর জাতিদের এই ক্রমাগত হানায় রোম সম্রাটরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। রাজধানী হিসাবে রোমকে আর ততটা নিরাপদ মনে হয় না। এই সময় রোমের সম্রাট ছিলেন কনস্টানটাইন (৩২৩-৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)। সম্রাট কনস্টানটাইন একটি নতুন রাজধানীর খোঁজ করতে থাকেন। এবং অবশেষে গ্রীক নগর বাইজান্তিয়ামে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে এই নগরের নতুন নামকরণ হয় কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টিনোপল ছিল সে সময় ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র। কনস্টানটাইন তাঁর দপ্তর বাইজান্তিয়ামে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য দুভাগ হয়ে যায়। বাইজান্তীয় সাম্রাজ্য পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ দীর্ঘকাল ধরে রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করে আসছিলেন কিন্তু রোম সম্রাটরা ছিলেন খ্রীষ্টধর্মের বিরোধী। গোড়ার দিকে খ্রীষ্টানদের ওপরে এরা নানান অত্যাচার করে কিন্তু সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্মের মহত্ত্বে মুগ্ধ হন এবং তিনি প্রথম খ্রীষ্টধর্মকে রোমের অন্যতম বৈধ ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেন। সম্রাট কনস্টানটাইন বেশ কয়েকবার তাঁর শত্রুদের কাছে যুদ্ধে হেরে যান। শোনা যায় একবার

তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যুদ্ধে জয়ী হলে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। সৌভাগ্যক্রমে এর ঠিক পরের যুদ্ধেই তিনি জয়ী হন এবং স্বয়ং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে খ্রীষ্টধর্মকে রোমের বৈধ ধর্ম হিসেবে স্বীকার করে নেন।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান

৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্তীয় সাম্রাজ্যের সম্রাট হলেন জাস্টিনিয়ান। জাস্টিনিয়ানই ছিলেন পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। শোনা যায় ইলিরিয়ার এক চাষী বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষ ও পরিশ্রমী। রোম সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তাঁর উৎসাহ ও যত্নের বিরাম ছিল না। তাঁর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এমনকি শোনা যায় যে



জাস্টিনিয়ান

রাত্রেও তিনি ঘুমনো বিশেষ প্রয়োজন বোধ করতেন না। খাবার-দাবার এবং পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন নিতান্তই সাদাসিদে।

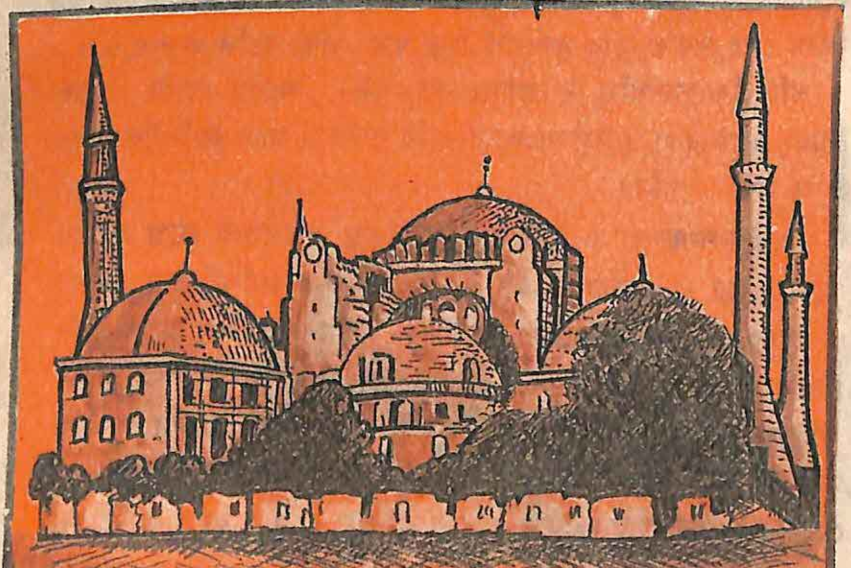
ধর্মে ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। রোমের ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল খুবই উঁচু। রোমের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করাই ছিল তাঁর প্রধান স্বপ্ন।

জাস্টিনিয়ান ছিলেন একজন শক্তিশালী সম্রাট। রোম সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনায় তিনি বহুল পরিমাণ সফল হয়েছিলেন। তিনি ভ্যান্ডালদের হাত থেকে আফ্রিকার উত্তরাংশ এবং গথদের হাত থেকে ইতালি ও স্পেনের দক্ষিণাংশ জয় করেন। এইসব যুদ্ধে জয়লাভে প্রধান কৃতিত্ব ছিল তাঁর সেনাপতি বেলিসেরিয়াসের। বেলিসেরিয়াস ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি। বাইজান্তীয় সাম্রাজ্যের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখায় তাঁর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে চিড় খায়। এবং তিনি কারারুদ্ধ হন ও তাঁর বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও রোমসাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুরোপুরি ফিরিয়ে আনা জাস্টিনিয়ানের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আইন-সংকলন ও তার গুরুত্ব: কিন্তু সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হলেও একটি বিশেষ দিকে জাস্টিনিয়ান অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রোমের আইন-সংকলনই হচ্ছে তাঁর প্রাধান কৃতিত্ব। যুগের পর যুগ ধরে রোমে গড়ে উঠেছিল নানান আইনকানুন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রোম সম্রাটরা অসংখ্য আইনকানুন প্রণয়ন করেছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর রোমের এইসব আইনকানুন প্রায় অচল হয়ে যায়। বর্বর জাতিরাও রোমের আইনকানুনের প্রতি ছিল প্রায় উদাসীন। তারা রোমের এইসব আইনকানুনকে কখনই বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের প্রধান কৃতিত্ব ছিল রোমের এইসব অপ্রচলিত আইনকানুনের এক বিধিবদ্ধ সংকলন। জনৈক আইনবিশারদের সাহায্যে জাস্টিয়ান রোমের আইনকানুন সংকলন করেন এবং

তাঁর সাম্রাজ্যে এই আইনগুলি চালু করেন। পরবর্তী কালে জাস্টিনিয়ানের এই আইন-সংকলনের আদর্শে ইউরোপের নানান দেশে আইনকানুনগুলি গড়ে ওঠে।

স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ সম্রাট জাস্টিনিয়ান ছিলেন সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও চিত্রকলার একজন পৃষ্ঠপোষক। রোমের অনুকরণে তিনিও কনস্টান্টিনোপলে অসংখ্য প্রাসাদ, গির্জা ও জলাশয় তৈরি করেন। কনস্টান্টিনোপলে সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা নির্মাণ তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি ও বাইজান্তীয় স্থাপত্যকলার এক চমৎকার নিদর্শন। গির্জা ছাড়া তিনি আরো তৈরি করেছিলেন



সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা

অসংখ্য সুরম্য প্রাসাদ, সৌধ ও স্নানাগার। স্নানাগারগুলি ছিল নগরের বিলাসিতার কেন্দ্র। এই স্নানাগারগুলি ব্যবহার করতেন ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে বাইজান্তিয়াম নগরের গুরুত্ব ঃ বাইজান্তিয়াম শহর ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্র। শিল্প-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের কীর্তির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা ছিল

বাইজান্তীয় স্থাপত্যশিল্পের এক চরম নিদর্শন। এই গির্জা ও অন্যান্য সৌধ ও অট্টালিকা নির্মাণে ছিল প্রাচ্যের প্রভাব। বাইজান্তিয়ামে চিত্রশিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। এই শিল্প 'মোজেইক শিল্প' নামে পরিচিত। রঙিন পাথর সাজিয়ে নানান ধরনের চিত্র বা ছবি রচনা করে প্রাসাদ ও সৌধ অলংকৃত করা হত। ধাতুর তৈরি নানান ধরনের গয়না-গাঁটি ও বাসন-কোসন তৈরিতেও বাইজান্তীয় শিল্পীরা জাঁকজমক ও আড়ম্বর খুব বেশী পছন্দ করত। সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানেও বাইজান্তীয় সাম্রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যেও বাইজান্তীয় সাম্রাজ্য প্রচুর উন্নতি লাভ করে। নানান দেশবিদেশ বিশেষত প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারত, সিংহল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত মিশর ও লোহিতসাগরের পথে। রাশিয়া ও চীনের সঙ্গেও বাণিজ্য চলত। কিন্তু এই বাণিজ্যের লেনদেন হত স্থলপথে। রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর অঞ্চল থেকে আমদানি হত খাদ্যশস্য ও পশুচর্ম। আফ্রিকার আবিসিনিয়া থেকে আসত হাতির দাঁত, সোনাদানা আর নিগ্রো দাস। চীন থেকে আমদানি হত মহার্ঘ রেশমবস্ত্র। ভারত ও সিংহল থেকে আসত নানান ধরনের মশলাপাতি, দামী পাথর ও গন্ধদ্রব্য। বাইজান্তিয়াম থেকে রপ্তানি হত কাচ ও এনামেলের বিভিন্ন জিনিসপত্র এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমলেই চীন থেকে অর্থাৎ প্রাচ্য থেকে ইউরোপে রেশমশিল্পের আমদানি হয়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই চীনে রেশমের গুটিপোকার চাষ হত। শোনা যায় দুজন খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমলে চীন থেকে ফাঁকা বেতের মধ্যে করে লুকিয়ে গুটিপোকার ডিম বাইজান্তিয়ামে নিয়ে যায়। পরে বাইজান্তিয়াম থেকে এই শিল্প ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু সম্পদ ও সমৃদ্ধি সত্ত্বেও বাইজান্তীয় সাম্রাজ্যের পতন রোধ করা সম্ভব হয়নি। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন দুর্বল। সাম্রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। গৃহবিবাদ ও আত্মকলহে সাম্রাজ্যের ভিত ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। ধর্মগত বিরোধও ছিল। ক্রমাগত বহিঃশত্রুর আক্রমণে এই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। পারসিক, আরব ও তুর্কীরা বারবার এই সাম্রাজ্যে হানা দেয়। অবশেষে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্কী নামে এক জাতির হাতে বাইজান্তীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এইভাবে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের অবসান হয়।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী**

(ক) কনস্টানটাইন কে ছিলেন ?

(খ) তিনি কোথায় রাজধানী স্থাপন করেন ?

(গ) জাস্টিনিয়ান কে ? কত খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাট হন ?

(ঘ) বেলিসেরিয়াস কে ছিলেন ?

(ঙ) সেন্ট সোফিয়ার গীর্জা কে নির্মাণ করেন ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

(ক) সম্রাট জাস্টিনিয়ানের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল ?

(খ) বেলিসেরিয়াসের কৃতিত্ব সংক্ষেপে লেখ।

(গ) সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সংস্কৃতি ও শিল্পকৃতির পরিচয় দাও।

(ঘ) বাইজান্তিয়ামের চিত্র ও স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে কি জান ?

(ঙ) সম্রাট জাস্টিনিয়ান কেন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ?

৩। **রচনাত্মক**

(ক) জাস্টিনিয়ানের প্রধান কৃতিত্ব কি ?

(খ) সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আইন-সংকলন ও তার গুরুত্ব আলোচনা কর।

(গ) বাইজান্তিয়ামের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(ঘ) কিভাবে বাইজান্তীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ?

৫ ইসলাম ও তার প্রতিক্রিয়া

আরবদেশ ও জাতিঃ যীশুর জন্মভূমি প্যালেস্টাইনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মাঝামাঝি এক বিশাল ভূখন্ড জুড়ে আরব দেশ। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে এই আরব দেশে জন্ম হয়েছিল এক নতুন ধর্মের। এই ধর্মের নামই ইসলাম ধর্ম। এরই পাশাপাশি এককালে গড়ে উঠেছিল সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। উত্তরে ছিল ফিনিসীয় ও ইহুদীদের দেশ। আরবরা ছিল সেমিটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত। আরব দেশ মরুভূমিময়। দিগন্তবিস্তৃত ধু-ধু বালুরাশি। এরই মাঝে মাঝে ছোট ছোট মরূদ্যান ও শহর। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে আরবরা ছিল যাযাবর ও ধর্মে পৌত্তলিক। এদের বলা হত বেদুইন। উটের পিঠে চেপে এরা ঘুরে বেড়াত দেশ-বিদেশে ও ব্যবসা-বাণিজ্য করত। উটের দুধ ও খেজুর ছিল এদের প্রধান খাদ্য।

আরবরা বহু দল ও জাতিতে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি প্রায় লেগেই থাকত। আরবেরা ছিল অসংখ্য দেবদেবীর উপাসক। আরবের প্রধান শহর মক্কা। মক্কায় কাবা নামে এক মসজিদ ছিল। কাবা মসজিদে ছিল তিনশর বেশি দেবদেবীর মূর্তি। প্রধান দেবতা ছিলেন আল্লা। একটা কালো পাথর ছিল আল্লার প্রতীক। আরবে বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য মানুষ আসত এই কাবা মসজিদে তীর্থ করতে। মুখে মুখে রচনা করত কবিতা ও গান। এইসব কাব্য ও গাথা নিয়েই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন আরবী সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

হজরত মহম্মদ ও তাঁর শিক্ষাঃ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে কোরেশ নামে এক বংশে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। কোরেশ বংশ ছিল কাবা

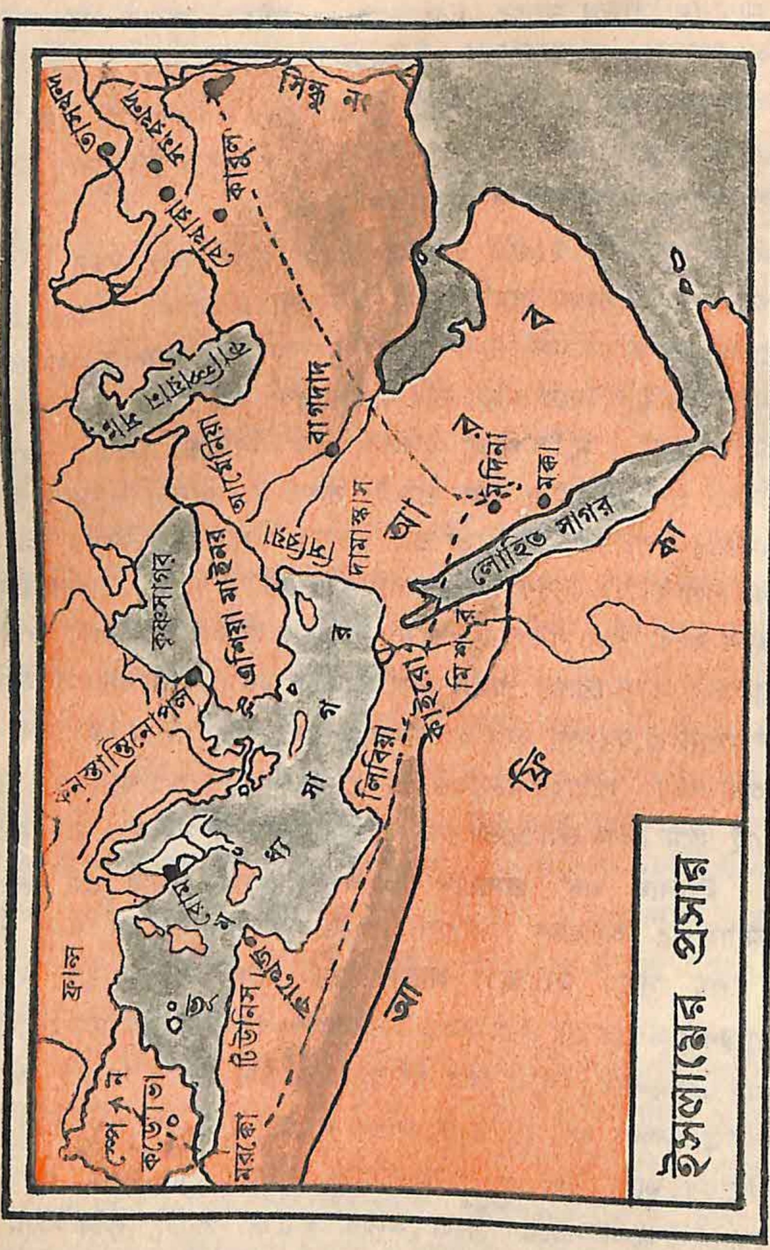
মন্দিরের রক্ষক। জন্মের পূর্বেই হজরত মহম্মদের পিতার মৃত্যু হয়। অতএব তাঁর অভিভাবক হলেন পিতৃব্য আবু-তালেব। ছেলেবেলায় লেখাপড়ার বিশেষ কোন সুযোগ তাঁর ঘটেনি। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পিতৃব্যের সঙ্গে তিনি আরবের নানান স্থান পরিভ্রমণ করেন। এইভাবে সঞ্চয় করেন বহু অভিজ্ঞতা। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি খাদিজা নামে এক ধনী বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন। এই সময় থেকেই তার জীবনের পরিবর্তন ঘটে। আরবের প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হন এবং মক্কার কাছাকাছি হীরা নামে এক পর্বতগুহায় তপস্যা শুরু করেন। এই সময়েই তিনি ঈশ্বরের বাণী লাভ করেন এবং এই বাণী প্রচারের নির্দেশ পান। ঈশ্বরের এই বাণী ইসলাম ধর্ম নামে পরিচিত। ইসলাম শব্দটির অর্থ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। ইসলাম ধর্মের মূল কথা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাই ঈশ্বর। মহম্মদ এই আল্লা কর্তৃক প্রেরিত মহাপুরুষ বা পয়গম্বর। ঈশ্বরের বাণী লাভের পরে মহম্মদ তাঁর ধর্ম প্রচার শুরু করেন। কিন্তু মক্কার কোরেশ বংশের সঙ্গে তাঁর বিরোধ শুরু হয়। মহম্মদকে হত্যার জন্য তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে। অবশেষে একদিন রাত্রে মহম্মদ তাঁর প্রধান শিষ্য আবু বকরকে নিয়ে মক্কা থেকে কিছু দূরে মদিনা নামে এক শহরে পালিয়ে যান। এই ঘটনা ঘটেছিল ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। মুসলমানদের কাছে এই বছরটি হিজরত নামে পরিচিত। এই সময় হতেই 'হিজরি' অব্দের প্রচলন হয়।

মদিনা ছিল সে সময়ে এক অখ্যাত গ্রাম। মদিনার অধিবাসীরা হজরত মহম্মদকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই মক্কার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকাল বিরোধ চলে। অবশেষে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মক্কা জয় করেন। একমাত্র আল্লার মূর্তি ছাড়া তিনি কাবা মসজিদের সকল দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেন। অতঃপর মক্কাবাসীরা মহম্মদের ধর্ম ও শাসন মেনে নেয়। এরপর

আরবের বিভিন্ন স্থানে এবং আরবের বাইরে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। মিশর আবিসিনিয়া, কনস্টান্টিনোপল এবং চীনে তিনি ধর্মদূত প্রেরণ করেন। সম্রাট হেরাক্লিসের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। এইভাবে তিনি ইসলাম ধর্মের দিগ্বিজয়ের সূত্রপাত করেন। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মদিনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মের মূল কথা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। ইসলাম ধর্মে আল্লাই ঈশ্বর বা ভগবান। আল্লার বাণী লেখা রয়েছে কোরাণ নামক গ্রন্থে। কোরান মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। মহম্মদের মুখ দিয়ে আল্লা তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন। আল্লার কোন মূর্তি নেই। মূর্তিপূজা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ, একমাত্র আল্লার নিকট প্রার্থনা করলে আল্লা প্রার্থীর সকল মনোবাসনা পূরণ করেন! আল্লার ওপর নির্ভরশীলতা তাই ইসলাম ধর্মের মূল কথা। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কয়েকটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য আছে। মক্কার দিকে মুখ করে দিনে পাঁচবার প্রার্থনা, দরিদ্রকে জাকাৎ বা ভিক্ষা দেওয়া, রমজান মাসে রোজা পালন এবং চতুর্থত মক্কায় তীর্থযাত্রা বা হজ। মদ্যপান, জুয়াখেলা এসব ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। ইসলাম ধর্ম সহজ ও অনাড়ম্বর। সাধারণ মানুষও এই ধর্মের কথা সহজেই বুঝতে পারে। এই ধর্মে কোন জাতিভেদ নেই। সব মুসলমানই সমান ও ভাই-ভাই।

ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণঃ ইসলাম ধর্মের এই সহজ অনাড়ম্বর আবেদন অবশেষে পৌত্তলিক বেদুইনদের মনে এক বিশেষ সাড়া জাগায়। আরবজাতির মধ্যে এক অদ্ভুত নতুন প্রেরণার সঞ্চার হয় এবং সমগ্র আরবদেশে ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলে। এই ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহম্মদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আরব জাতি ইসলাম ধর্ম প্রচারে ও প্রসারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, পারস্য ও মিশর অধিকৃত হয়। একশো বছরের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য পূর্বে তুর্কিস্থান ও সিন্ধুদেশ এবং পশ্চিমে আফ্রিকা ও স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।


ইসলামের প্রসার
সিন্ধু নদ
কাবুল
বাগদাদ
আর্মেনিয়া
মদিনা
মক্কা
লোহিত সাগর
দামাস্কাস
কৃষ্ণসাগর
এশিয়া মাইনর
কনস্তান্তিনোপল
লিবিয়া
কাইরো
মিশর
টিউনিস
মরক্কো
ফ্রান্স

পরবর্তী কালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। মনে হল যেন এই ধর্ম গোটা ইউরোপকে গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু মহম্মদের মৃত্যুর একশো বছর পরে তুর-এর যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কদের নেতা চার্লস মার্টেল-এর হাতে আরবরা পরাজিত হয়। ইসলামের হাত থেকে ইউরোপের খ্রীষ্টধর্ম পরিত্রাণ পায়।

ইসলাম ধর্মের এই জয়যাত্রা ও প্রসার সম্ভব হয়েছিল কয়েকটি কারণে। প্রথমত, এই সময়ে বাইজান্তীয় ও পারস্য—এই উভয় সাম্রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণ শাসকদের নানান জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে ইসলাম ধর্মের অনাড়ম্বর বাণী জনসাধারণের মনে এক নতুন প্রেরণার সঞ্চার করে। এই ধর্মে কোন জাতিভেদ না থাকায় পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি খুব সহজেই এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

খলিফাঃ ইসলামের এই দিগ্বিজয়ে নেতৃত্ব করেছিল খলিফারা। খলিফারা ছিলেন একাধারে ইসলামের ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনেতা। মহম্মদের প্রধান শিষ্য ছিলেন আবু বকর। মহম্মদের মৃত্যুর পর আবু বকর প্রথম খলিফা নিযুক্ত হন। আবু বকরের মৃত্যুর পর খলিফা হন ওমর। ওমরের পর একে একে খলিফা নিযুক্ত হন ওসমান ও আলি। এঁরা সবাই ছিলেন সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের পক্ষপাতী। এই চারজন খলিফা পুণ্যবান খলিফা নামে বিখ্যাত।

আবু বকর ছিলেন মহম্মদের কনিষ্ঠা পত্নী আয়েশার পিতা এবং মহম্মদের এক পরম ভক্ত। মক্কায় কোরেশরা যখন তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তখন তিনি মহম্মদকে নিয়ে মদিনায় পালিয়ে যান। তিনি এক পর্ণকুটীরে বাস করতেন এবং মসজিদে বসে রাজকার্য চালাতেন। মৃত্যুর সময় তিনি ওমরকে বলেছিলেনঃ 'আমার খিলাফতে প্রয়োজন নেই।'

ওমর ছিলেন সরল-প্রকৃতি ও কষ্টসহিষ্ণু। আবু বকর মারা যাবার পর তিনি খলিফা নিযুক্ত হন। ওমর প্রথমে ইসলাম ধর্মের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরে এই ধর্মের অনুরাগী হয়ে পড়েন। ওমরের আমলে আর্মেনিয়া, মিশর, পারস্য সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ইসলামের অধিকারে আসে। তাঁর সাম্রাজ্য শাসনের জন্য তিনি এক সুন্দর শাসনযন্ত্র গড়ে তোলেন।

ওমরের পর খলিফা হন ওসমান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে জনৈক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হলে মহম্মদের জামাতা আলি খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। এই সময় থেকে ইসলাম ধর্মে এক প্রবল অন্তর্বিরোধ শুরু হয়। আলির বিরোধী ছিলেন সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া। খলিফা হওয়ার বছর পাঁচেকের মধ্যে আলি নিহত হন এবং মুয়াবিয়া খলিফার পদ দখল করেন। এই সময় থেকে ইসলাম ধর্মের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। আলির সমর্থকরা শিয়া নামে পরিচিত হন, মুয়াবিয়ার সমর্থকদের বলা হত সুন্নী। হাসান ও হোসেন নামে আলির দুই পুত্র ছিল। মুয়াবিয়ার ষড়যন্ত্রে জ্যেষ্ঠপুত্র হাসান নিহত হন। কনিষ্ঠ পুত্র হোসেন মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদকে খলিফা হিসেবে স্বীকার না করায় হোসেনের সঙ্গে এজিদের এক সংঘর্ষ হয়। কারবালা নামে এক মরুপ্রান্তরে এজিদের সৈন্যদল হোসেনকে অবরোধ করে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় হাসানের পরিবার বিশেষ বিপন্ন হয়ে পড়ে। হোসেন জলের সন্ধানে তাঁর শিবির থেকে বাইরে বেরিয়ে এজিদের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। কারবালার এই মর্মন্তুদ ঘটনাকে মুসলমানরা এখনও মহরম নামে এক পর্বের মধ্যে দিয়ে স্মরণ করে। মুয়াবিয়ার বংশধররা একশ বছরেরও ওপর খলিফার পদ অধিকার করেছিলেন। এই বংশ পরিচিত ছিলেন উমাইয়াদ বংশ নামে। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের পিতৃব্য আব্বাসের বংশের এক নেতা খলিফার পদ দখল করেন। এরপর শুরু হয় আব্বাসীয় খলিফাদের যুগ। আব্বাসীয়দের শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুন অল রশীদ। বাগদাদ ছিল তাঁর রাজধানী।

আরব সাম্রাজ্য—কর্ডোভাঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের গোড়ায় (৭১২ খ্রীঃ) মুসলমানরা ইউরোপের স্পেন নামে এক দেশ দখল করেন। স্পেনে মুসলমানদের অধিকার বহুকাল টিকে ছিল এবং গড়ে উঠেছিল এক সুন্দর সংস্কৃতি। স্পেনের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। এছাড়া ছিল গ্রানাডা, সেভিল, টলেডো প্রভৃতি সুন্দর নগর। কর্ডোভাকে কেন্দ্র করে স্পেনে এই সময়ে মুসলমান স্থাপত্যকলা বিশেষ বিকাশ লাভ করে। কর্ডোভায় গড়ে ওঠে এক সুন্দর মসজিদ। অপরূপ স্তম্ভ ও খিলান, চমৎকার গঠনভঙ্গী ও সুন্দর অলংকরণের জন্য কর্ডোভার মসজিদ মুসলিম স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে এখনও টিকে আছে। গ্রানাডা, সেভিল প্রভৃতি নগরীতেও গড়ে উঠেছিল অসংখ্য প্রাসাদ ও মসজিদ। গ্রানাডার আলহামরা প্রাসাদটি বিশেষ বিখ্যাত।

ইসলামী কৃতিত্বে ইউরোপের প্রতিক্রিয়াঃ ইউরোপে ইসলামী সভ্যতা প্রসারের গোড়ার দিকে খ্রীষ্টান ইউরোপ এই ধর্মের প্রতি বিশেষ বিরূপ ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলামী সভ্যতা প্রায় গোটা ইউরোপকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু তুরের রণক্ষেত্রে ফ্রাঙ্ক নেতা চার্লস মার্টেলের হাতে মুসলমানেরা পরাজিত হলে ইউরোপ রক্ষা পায়। স্পেনে ইসলামী সভ্যতা বিকাশলাভ করলে এই সভ্যতার প্রতি খ্রীষ্টানদের বিরূপ মনোভাব ধীরে ধীরে কেটে যায়, এবং ইউরোপ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট ও আগ্রহী হয়ে ওঠে। স্পেনের ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে খ্রীষ্টানরা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করে। ইসলামী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রতি খ্রীষ্টানদেরও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়।

শিল্প, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে আরবদের অবদানঃ আরবরাও ছিল জার্মানদের মতো প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী। গোড়ার দিকে তাদের সংস্কৃতি ছিল খুবই নীচু মানের। কিন্তু ইসলাম

ধর্ম ও আরবী ভাষা গ্রহণ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও স্পেনের অধিবাসীরা আরব নামে পরিচিত হয়। আরব বলতে আরবীভাষী মুসলমানদের বোঝায়। পারসিক, গ্রীক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আরবরা গড়ে তোলে এক নতুন সভ্যতা। সমগ্র ইউরোপ



কাবা মসজিদ

যখন মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমগ্ন তখন কায়রো, বাগদাদ, কর্ডোভা এইসব নগরই জ্বালিয়ে দিল জ্ঞান ও সভ্যতার আলো। গ্রীক ও ভারতীয়দের কাছ থেকে আরবরা শিখে নেয় জ্যামিতি, গণিত, বীজগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা। অঙ্কের রাশি ও দশমিক ভারত থেকে গ্রহণ করে। আরবদের কাছ থেকে আবার এইগুলি শিখে নেয় ইউরোপ। আবর বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় রসায়নবিদ্যার জন্ম হয়। চীন থেকে আরবরা আয়ত্ত করে কাগজ তৈরি করার পদ্ধতি। ইউক্লিডের জ্যামিতির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে আরবদের জ্যামিতি। ইতিহাস

রচনাতেও আরবরা এক নতুন পথ প্রবর্তন করে। নানান কাহিনী ও কিংবদন্তী থেকে ইতিহাসের তথ্য আহরণে ও তার বিশ্লেষণে আরবরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। মুসলমানদের মসজিদগুলি ছিল এক-একটি শিক্ষাগার। পরে এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। দেশবিদেশ থেকে নানান জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটত এইসব স্থানে।

কয়েকজন আরব মনীষী: মনীষীদের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আবুসিনা। তাঁর জন্ম হয়েছিল তুর্কীস্তানের বোখারায়, পরে তিনি খোরাসানে অধ্যাপনা করেন। দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন ইবন রুবাদ। ধর্মের অনুশাসন থেকে দর্শনকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন খালদুন। অল বিরুণী ও ইবন বতুতা ছিলেন দুজন বিখ্যাত পর্যটক। অল বিরুণী ছিলেন সুলতান মামুদের সভাকবি। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ভারত সম্পর্কে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন বতুতা মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বে ভারতে আসেন। ভারত থেকে সুলতানের দূত হিসেবে চীনে যান। 'সফরনামা' নামে তিনি ভ্রমণ-কাহিনী লেখেন। অল বিরুণী ও বতুতার ভ্রমণকাহিনী থেকে সে আমলের ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী**

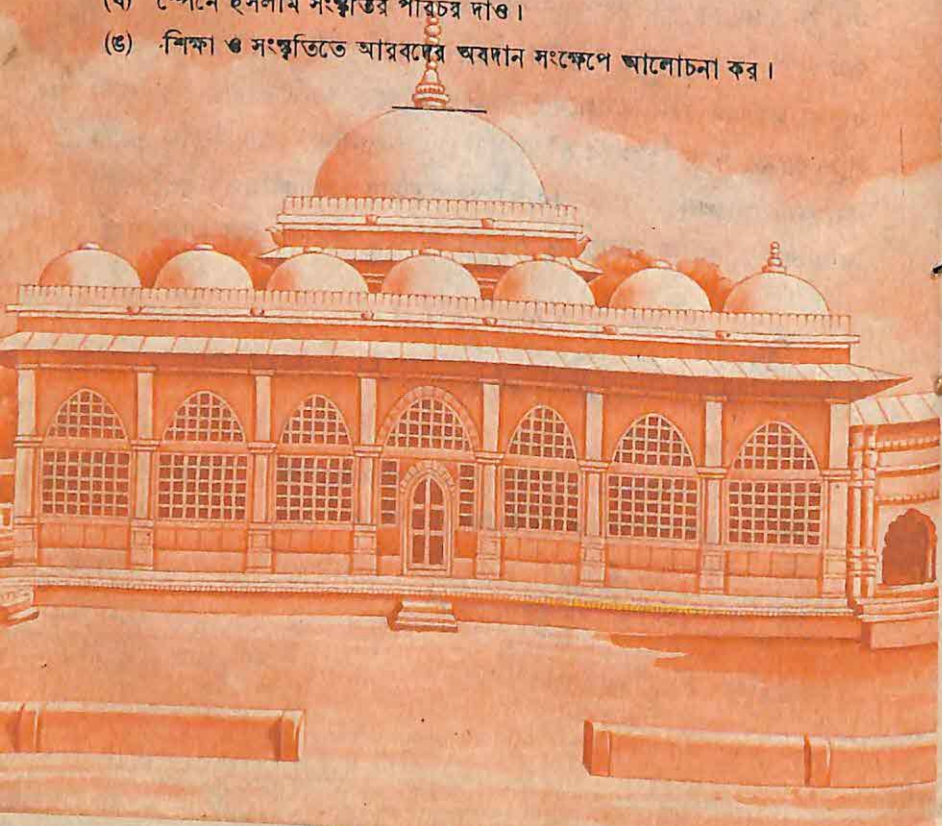
(ক) ইসলাম ধর্মের কোথায় জন্ম হয়েছিল ?
(খ) আল্লা কে ?
(গ) কোন বংশে কত খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের জন্ম হয় ?
(ঘ) হজরত মহম্মদের প্রধান শিষ্যের নাম কি ?
(ঙ) খলিফা কাদের বলে ?
(চ) অল বিরুণী ও ইবন বতুতা কে ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

(ক) আরব দেশ কি রকম? আরব জাতি সম্বন্ধে কি জান?
(খ) খাদিজা কে? তাঁকে বিয়ে করার পর মহম্মদের জীবনে কি পরিবর্তন ঘটে?
(গ) ইসলাম শব্দটির অর্থ কি? হিজরী কাকে বলে?
(ঘ) ইসলাম ধর্মের মূল কথা কি?
(ঙ) খলিফা ওমর সম্বন্ধে কি জান?

৩। রচনাত্মক

(ক) হজরত মহম্মদের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(খ) ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণগুলি সংক্ষেপে লেখ।
(গ) কারবালার ঘটনা সম্বন্ধে কি জান?
(ঘ) স্পেনে ইসলাম সংস্কৃতির পরিচয় দাও।
(ঙ) শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আরবদের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।



৬ মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

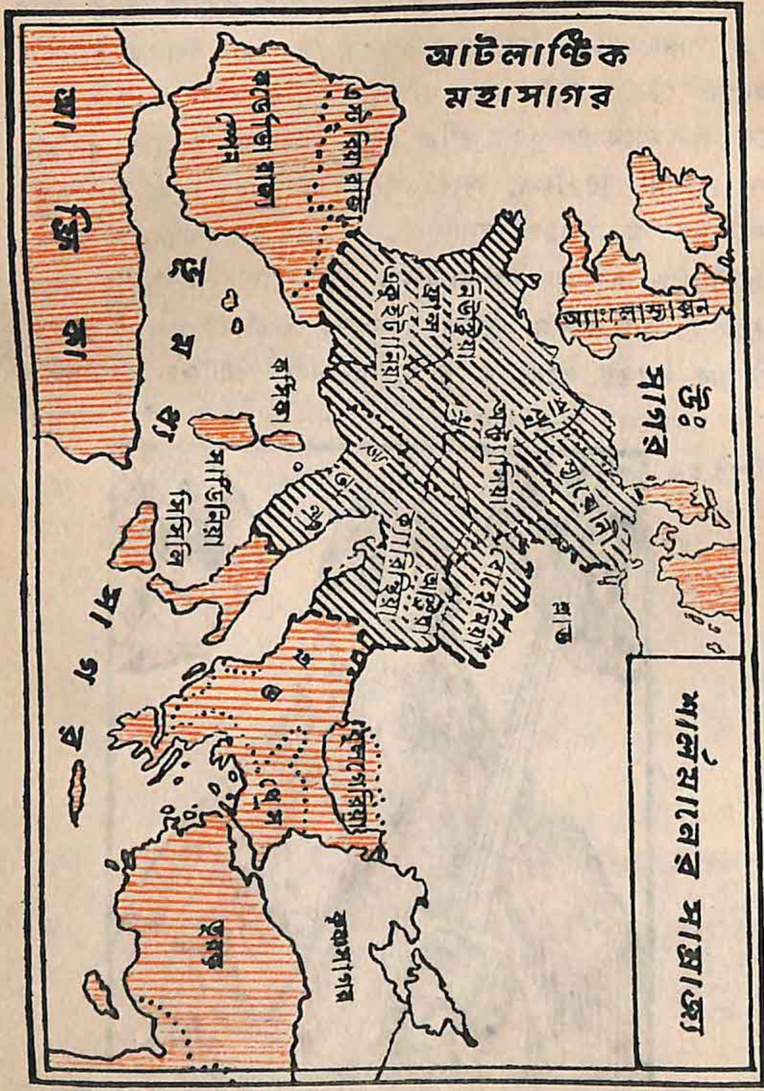
শার্লামেন ঃ পূর্বে বলা হয়েছে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর এই সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর বর্বর জার্মান জাতিরা কয়েকটি রাজ্য গড়ে তোলে। রাইন নদীর দক্ষিণ তীরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষে ফ্রাংক নামে এক বর্বর জাতি একটি রাজ্য গড়ে তোলে। বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর কিছু অংশ জুড়ে এই রাজ্য গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রের সব ক্ষমতাই ছিল প্রাসাদের মেয়র নামে রাজকর্মচারীর হাতে। পরবর্তীকালে এই পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের গোড়ায় চার্লস মার্টেল ফ্রাংকদের নেতা হন। এই চার্লস মার্টেলের হাতেই তুরের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিল। চার্লস মার্টেলের পর তাঁর পুত্র পিপিন ফ্রাংক রাষ্ট্রের সর্বময় অধীশ্বর হন।



শার্লামেন

পিপিনের মৃত্যুর পর ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র শার্লামেন সিংহাসনে বসেন। শার্লামেনই ছিলেন ফ্রাংকদের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ছিলেন বাগদাদের খলিফা হারুন অল রশীদের সমসাময়িক। তাঁর

জানা যায়। তাঁর দেহ ছিল সুগঠিত। উজ্জ্বল চোখ, তীক্ষ্ন নাক, মুখে হাসি লেগেই থাকত। পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন খুবেই



সাদাসিধে। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন এবং তাদের নিয়ে শিকারে যেতেন। শিকার করা, সাঁতার কাটা এবং ঘোড়ায় চড়ায়

ছিল তাঁর প্রচুর উৎসাহ। তিনি অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। শোনা যায় এক ঘুঁসিতে নাকি তিনি ঘোড়া ও আরোহীকে একসঙ্গে ধরাশায়ী করতে পারতেন। তাঁর মন ছিল খুব সহজ ও সরল। রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তিনি প্রাণ খুলে মিশতেন। প্রজাদের কাছ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ নিতেন এবং তাদের সুখ-দুঃখের খবর সংগ্রহ করতেন।

শার্লামেন ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। তিনি ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেন। এই ৪৬ বছরে ৫২ বার যুদ্ধযাত্রা করেন। দক্ষিণে পিরেনীজ এবং আল্পস পর্বত ডিঙিয়ে ছিল তাঁর রাজ্যের সীমা। স্পেনের মুর, ইতালীর লম্বার্ড, জার্মানীর স্যাক্সন এবং আরবদের তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ জয় করে তিনি সসৈন্য পিরেনীজ পর্বত হয়ে ফ্রান্সে ফিরছিলেন। এমন সময় গ্যাসকন নামে এক জাতি তাঁর সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে। রোল্যান্ড নামে জনৈক অধিনায়ক বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে গ্যাসকনদের গতিরোধ করে যুদ্ধে প্রাণ হারান। কিন্তু ফ্রাঙ্ক সৈন্য নিরাপদে পিরেনীজ পেরিয়ে যায়। রোল্যান্ডের এই বীরত্বের কাহিনী 'রোল্যান্ডের গীতি' নামে লোকগাথায় আজও অমর হয়ে আছে। কিন্তু জার্মানীর হিংস্র স্যাক্সন জাতিদের দমন করতে তাকে বিশেষ বাধা পেতে হয়েছিল। ফ্রাঙ্করা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্যাক্সনরা ছিল পৌত্তলিক। শার্লামেন স্যাক্সনদের দমন করার জন্য বদ্ধপরিকর হন। অবশেষে কোন উপায় না দেখে কয়েক হাজার বন্দী স্যাক্সনকে তিনি হত্যা করেন। অতঃপর স্যাক্সনরা বশীভূত হয় ও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। শার্লামেনের খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি বাগদাদের খলিফা হারুন অল রশীদ তাঁকে একটি হাতি ও জলঘড়ি উপহার দেন।

পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার (৮০০ খ্রীঃ)ঃ পূর্বে বলা হয়েছে ফ্রাঙ্করা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। ইউরোপে রোম ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রধান কেন্দ্র। এই ধর্মের রক্ষাকর্তা ছিলেন

খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠান চার্চ বা গীর্জার প্রধান। বাইজান্তীয় বা পূর্ব রোম সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি স্বতন্ত্র চার্চ। পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টানরা ছিল রোমের চার্চ বা পোপের অধীন। শার্লামেনের সমসাময়িক পোপ ছিলেন তৃতীয় লিও। একবার তিনি রোমের একদল বিরোধী পক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হন। কয়েকজন দয়ালু লোক তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তাঁকে শার্লামেনের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেন। লিও তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে শার্লামেনের সাহায্য ভিক্ষা করেন। শার্লামেনের সাহায্যে খুব শীঘ্র তাঁর শত্রুকে পরাস্ত করে প্রাসাদে ফিরে যান। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বড় দিনে শার্লামেন যখন রোমের সেণ্ট পীটার গীর্জায় উপাসনায় রত, সেই সময় পোপ তৃতীয় লিও তাঁর মাথায় সম্রাটের মুকুট পরিয়ে তাঁকে 'সীজার' ও 'অগাস্টাস' রূপে অভিনন্দন জানান। এইভাবে প্রায় তিনশ বছর পরে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং শার্লামেন সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হন। অতঃপর রোমের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনাই হল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

অভিষেকের গুরুত্ব—রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে সম্পর্কঃ শার্লামেন সম্রাট পদে অভিষিক্ত হওয়ায় পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য আবার বেঁচে ওঠে। বর্বর জাতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের যে গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তার পুনরুদ্ধার ঘটে। উত্তর ইউরোপ আরব সাম্রাজ্যের একটি অংশ বলে পরিগণিত হয়। শার্লামেন ছিলেন নিরক্ষর এবং ফ্রাঙ্কদের একটি ছোট্ট রাজ্যের অধীশ্বর। কিন্তু এই ঘটনার ফলে তাঁর মতন একজন সামান্য মানুষের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং এই সময় থেকে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে একটি মধুর ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শার্লামেনের মৃত্যুর পরেও বেশ কিছুকাল এই সম্পর্ক বজায় ছিল।

রাজসভা ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাঃ শার্লামেন ছিলেন নিরক্ষর। লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। কিন্তু তিনি ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতে পারতেন। গ্রীক ভাষাও বুঝতেন। লেখাপড়া না জানলেও শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক।

শোনা যায় শেষ বয়সে তিনি লেখা অভ্যাস করবেন বলে রোজ রাতে বালিশের নীচে স্লেট-পেন্সিল রেখে ঘুমোতেন। আর খাবার সময় তাঁকে ইতিহাস ও অন্যান্য বই পড়িয়ে শোনান হত। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর প্রাসাদে তিনি এক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন এবং সে যুগের অনেক ভালো ভালো বই নকল করে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে ইউরোপে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। শার্লামেন এঁদের কয়েকজনকে নিয়ে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হন। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এলকুইন নামে জনৈক ইংরেজ পণ্ডিত। ডেন আক্রমণে বিতাড়িত হয়ে তিনি শার্লামেনের রাজসভায় আসেন। এবং শার্লামেনের বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হন। শার্লামেন স্বয়ং এবং তাঁর সন্তান ও সভাসদগণ এলকুইনের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এইভাবে ইউরোপের মধ্যযুগীয় অন্ধকারে জ্বলে উঠল জ্ঞানের আলো। নব রোম সাম্রাজ্যের স্রষ্টা এবং মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে শার্লামেন ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ফ্রাঙ্ক রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত হয়। এই একভাগের অধিপতি নিজেকে রোম সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর খ্রীষ্টান জগতের প্রভুত্ব নিয়ে সম্রাট ও পোপের মধ্যে শুরু হয় এক দীর্ঘস্থায়ী বিবাদ ও সংগ্রাম।

মঠ, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী, মঠের জীবনঃ তৃতীয় অধ্যায়ে ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে মঠগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। চার্চ বা গীর্জার মতোই মঠও ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। লোকালয় থেকে দূরে কোন নির্জন স্থানে মঠগুলি তৈরি হত। পূর্বে বলা হয়েছে মধ্যযুগে ধর্ম ছিল মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সমাজে তাই পুরোহিত ও যাজকদের প্রভাব ছিল খুব বেশী। মানুষের জীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শুচিতা রক্ষাই ছিল এদের প্রধান কাজ। ধর্মকার্যে যাতে বাধা না জন্মে সেজন্য এদের বিয়ে-থার অনুমতি দেওয়া হত না।

প্রত্যেক গ্রামে থাকত একজন করে পুরোহিত। পুরোহিতদের ওপরে ছিল বিশপ। এছাড়া ছিল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ধর্মের জন্য জীবন



সন্ন্যাসী বা মঙ্ক

উৎসর্গ করাই ছিল এঁদের ব্রত। এঁদের বলা হত মঙ্ক। এঁরা মঠেই বসবাস করতেন। সন্ন্যাসিনীদের বলা কত নান্। এঁদের জন্য ছিল আলাদা মঠ বা নানারি। মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত অ্যাবট, সন্ন্যাসিনীদের মঠের প্রধান ছিলেন অ্যাবেস। প্রতিটি মঠের নিজস্ব নিয়মকানুন ছিল। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের এইসব নিয়মকানুন মেনে চলতে হত। কঠোর সংযম ছিল এদের জীবনের মূল কথা। মঠের কাজ-কর্ম পরিচালনা এবং নৈতিক চরিত্র রক্ষাই ছিল এদের প্রধান কাজ। খ্রীষ্টীয় অনুশাসন অনুযায়ী দারিদ্র, সততা প্রভৃতি কয়েকটি শপথ তাদের গ্রহণ করতে হত।

শিক্ষা প্রসার ও সংরক্ষণে মঠের ভূমিকাঃ মধ্যযুগের এই মঠগুলি ছিল শিক্ষার এক-একটি কেন্দ্র। নানান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। সন্ন্যাসীদের নানাবিধ কাজ করতে হত। হাসপাতাল ও বিদ্যালয় পরিচালনা, অতিথি-সৎকার ও দরিদ্র-সেবা ছিল এই সব শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। এছাড়া ছিল বাইবেল পাঠ, প্রার্থনা ও সাধন-ভজন, সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচার। এই ধর্মপ্রচারের

ভার ছিল ফ্রায়ার বা ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীদের ওপর। কিন্তু কালক্রমে চার্চ ও মঠ—এই উভয় প্রতিষ্ঠানই আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে নানান ব্যভিচার ও দুর্নীতি দেখা দেয়। নানান ভাবে অর্থ রোজগার করে মঠগুলি বিত্তশালী হয়ে ওঠে। সন্ন্যাসীদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে। চার্চ ও মঠগুলিকে এই দুর্নীতি থেকে মুক্ত করেন ক্লুনি নামে জনৈক ধর্মযাজক। ক্লুনি চার্চের কর্তৃত্বকেই প্রাধান্য দেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় চার্চ ও মঠের আদর্শ ও সংযম পুনরায় ফিরে আসে।

সম্রাট ও পোপের দ্বন্দ্ব ঃ মধ্যযুগে চার্চের প্রভাব ছিল খুব বেশি। কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, ধীরে ধীরে চার্চ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রাধান্য বিস্তার করে। ধর্মকে ভাঙিয়ে এবং ধর্মের নামে চার্চ বেশ কিছু মুনাফা লুটে নেয়। নানান ভাবে প্রভূত ধন-সম্পদ ও সম্পত্তির অধিকারী হয়। পাপের ভয়ে এবং পরকালে স্বর্গলাভের আশায় রাজা এবং অন্যান্য সামন্তরা সকলেই চার্চকে জমি এবং অন্যান্য ধন-সম্পদ দান করতে থাকে। এইভাবে চার্চের রাজনৈতিক প্রভাব খুব বেড়ে যায়। সম্রাটের কাছ থেকে চার্চ শুল্ক আদায়, এমনকি বিচারের ক্ষমতাও লাভ করে। পোপ ছিলেন চার্চের প্রধান। চতুর্থ শতক থেকে রোমের পোপ রোমান চার্চের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন এবং খ্রীষ্টধর্মের রক্ষক হিসাবে পরিগণিত হন। পূর্বে বলা হয়েছে, অষ্টম শতকে পোপ ও ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লামেনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পোপ তৃতীয় লিও শার্লামেনকে রোমের সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত করেন এবং তাঁকে সম্রাট বলে অভিনন্দন জানান। কিন্তু শার্লামেন মারা যাবার পর থেকেই রাজনৈতিক প্রাধান্য নিয়ে পোপের সঙ্গে সম্রাটদের বিরোধ দেখা দেয়। পোপের প্রধান কর্তব্য ছিল মানুষের ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এই সময় থেকে মানুষের পার্থিব ও রাজনৈতিক জীবনেও কর্তৃত্ব করার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। এদিকে সম্রাটরাও চার্চের উপর কর্তৃত্ব করতে চান এবং চার্চকে রাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করেন।

পোপ সম্রাটের এই কর্তৃত্ব মানতে চান না, এবং ঘোষণা করেন যে চার্চ পুরোপুরি স্বাধীন। চার্চের ওপর রাষ্ট্রের কোন ক্ষমতা নেই। এই নিয়ে শুরু হয় পোপ ও সম্রাটের জোর লড়াই। এই লড়াই চলেছিল দীর্ঘকাল। একাদশ শতকে (১০৭৩ খ্রীঃ) সপ্তম গ্রেগরি পোপ নিযুক্ত হলে বিরোধ চরমে ওঠে। এই সময়ে সম্রাট ছিলেন চতুর্থ হেনরি। পোপ সপ্তম গ্রেগরি ও চতুর্থ হেনরির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বও চলে দীর্ঘকাল। অবশেষে সম্রাট পরাজয় স্বীকার করেন। শোনা যায় পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য চতুর্থ হেনরিকে দীর্ঘ তিনদিন দিনরাত পোপের প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অবশেষে নগ্নপদে তিনি পোপের ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এতে পোপের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পোপ ও সম্রাট উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং পরস্পরের ভুল বুঝতে পারেন। এই বিরোধে পোপ বা সম্রাট কারুর বিশেষ কোন লাভ হয়নি। লাভবান হয়েছিল মধ্যযুগীয় শহরগুলি। পোপ ও সম্রাটদের দ্বন্দ্বের সুযোগে ইতালির শহরগুলির ক্ষমতা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মযুদ্ধ শুরু হলে তারা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। পোপ বা সম্রাট কারুরই কোন তোয়াক্কা তারা করেনি।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী—বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাঃ রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রোমের পুরানো শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। পূর্বে বলা হয়েছে বর্বর জাতিরা কিভাবে রোমের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করে। কিন্তু কালক্রমে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে এই বর্বর জার্মান জাতিদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ দেখা দেয় এবং খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে ইউরোপে এক নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল ধর্মভিত্তিক। গীর্জা ও মঠকে কেন্দ্র করে কিভাবে এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু গীর্জা ও মঠের শিক্ষা ছিল মূলতঃ ধর্মীয়। গীর্জা ও মঠের বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ তেমন

ছিল না। অথচ ছাত্রদের মধ্যে এ-সময়ে নানান বিষয়ে শেখবার আগ্রহ জাগে এবং নানান বিষয়ে তারা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এ-সময়ে যেসব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ছাত্রেরা সেইসব পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে যাতায়াত শুরু করে। এইভাবে শিক্ষক ও ছাত্রদের সমাবেশ থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের যে কোন দেশের ছাত্রই এইসব স্থানে পড়াশুনা করতে পারে। তাই এর নাম দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়। কালক্রমে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে এবং বিশেষ উন্নত হয়ে ওঠে।

শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কঃ এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক মধুর সম্পর্ক। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। নানান বিষয়ে তারা শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনে ও শিখে নিত। শিক্ষকরাও তাদের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করতেন। ছাত্র ও শিক্ষকদের অধিকাংশই আসত বিদেশ থেকে। এরা ছিল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। সে সময়ে ভিন্ দেশে বিদেশীদের জীবন মোটেই নিরাপদ ছিল না সুতরাং প্রয়োজন হয়ে পড়ল সংঘ বা জোট গড়ার। এই সংঘগুলিকেই বলা হত 'নেশন'। কোন কোন স্থানে শিক্ষকরাও নেশনে যোগ দিতেন। কালক্রমে নেশনগুলি শহরের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন আদায় করে নেয়। ধীরে ধীরে সেই নেশনগুলি কলেজে পরিণত হয়।

আইন, চিকিৎসা ও ধর্মশাস্ত্র চর্চাঃ এইভাবে ইউরোপে এই সময়ে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। এক-এক বিশ্ব-বিদ্যালয় এক-একটি বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ইতালির স্যালানো বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ ছিল চিকিৎসা-শাস্ত্রের জন্য। বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল আইন অধ্যাপনার। ফ্রান্সের প্যারি বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল ধর্মশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য। ইংল্যান্ডে এই সময়ে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ নামে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কতিপয় বিখ্যাত মনীষী :

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার ধরন বর্তমান কালের মতো ছিল না। বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সে সময়ে লোকের মনে বিশ্বাসই ছিল সব এবং পুরো শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল ধর্মভিত্তিক। বাইবেলের বাণীকে অভ্রান্ত ও বেদবাক্য বলে মনে করা হত। কিন্তু এই আমলে কয়েকজন চিন্তাশীল মনীষী এই শিক্ষা-রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং মানুষের মনকে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার এবেলার্ড। তাঁর কাছে যুক্তিই ছিল সবকিছু। যুক্তিগ্রাহ্য হলে তবেই যে কোন মতবাদ মেনে নেওয়া যায়। এ যুগের আরও দুই বিখ্যাত মনীষী এলবার্টাস ম্যাগনাস ও টমাস একুইনাস। ম্যাগনাস ছিলেন জার্মান এবং একুইনাস ইতালীয়। ম্যাগনাস প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও এ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যুক্তিবাদের ওপর ভিত্তি করে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। একুইনাস ছিলেন এ্যালবার্টাসের শিষ্য। আর এক বিখ্যাত মনীষী ছিলেন ইংলন্ডের রজার বেকন। ইনি ছিলেন মূলত বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের নানান দিক নিয়ে তিনি অনুশীলন করেন। তাঁর ছিল অসাধারণ দূরদৃষ্টি। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে মানুষ একদিন আকাশে ভ্রমণ করবে।

এযুগে দেশীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। নানান দেশে প্রচলিত গল্প ও কাহিনী অবলম্বনে চারণ-কবি ও গায়কেরা কাব্য ও গান রচনা করতেন। এছাড়া গড়ে উঠেছিল রাজা আর্থার ও তার নাইটদের নিয়ে এক উন্নত সাহিত্য। ইংলন্ডে রবিন হুডের কাহিনী ছিল বিখ্যাত। পোল্যান্ডের কাহিনী নিয়ে সূত্রপাত হয়েছিল ফরাসী কাব্য ও সাহিত্যের। মহাকবি দান্তে ইতালীয় ভাষায় 'ডিভাইন কমেডি' নামে একটি বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন। ইংলন্ডের বিখ্যাত কবি ছিলেন চসার। তাঁর রচিত 'ক্যান্টারবেরি টেলস' আজও অমর

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী

(ক) চার্লস মার্টেল কে ? কোন্ যুদ্ধে মুসলমানরা তাঁর হাতে পরাজিত হয় ?

(খ) শার্লামেন কে ? কত খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রাঙ্কদের রাজা হন ? শার্লামেনের জীবনী-লেখকের নাম কি ?

(গ) শার্লামেন কত বৎসর রাজত্ব করেন ? তাঁর রাজত্বকালে তিনি মোট কতবার যুদ্ধযাত্রা করেন ? তাঁর রাজ্যের সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল ?

(ঘ) রোল্যাণ্ড কে ? রোল্যাণ্ডের বীরত্বকাহিনী কোথায় পাওয়া যায় ?

(ঙ) হারুন অল রশিদ কে ? তিনি শার্লামেনকে কি উপহার পাঠিয়েছিলেন ?

(চ) তৃতীয় লিও কে ? তিনি কেন শার্লামেনকে রোম সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করেন ? কত খ্রীষ্টাব্দে শার্লামেন রোমের সম্রাট হন ? তাঁকে কী উপাধি দেওয়া হয় ?

(ছ) এলকুইন কে ছিলেন ? তিনি কি জন্য বিখ্যাত ?

(জ) সপ্তম গ্রেগরি কে ছিলেন ? তাঁর সঙ্গে কার বিরোধ ঘটে ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

(ক) শার্লামেনের দৈহিক গড়ন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(খ) কোন্ কোন্ জাতির সঙ্গে শার্লামেন যুদ্ধ করেন ?

(গ) রোল্যাণ্ডের বীরত্বকাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(ঘ) শার্লামেন কিভাবে পবিত্র রোমক সম্রাট হন ?

(ঙ) শার্লামেনের বিদ্যানুরাগ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(চ) মঠ কাকে বলে ? এই মঠে কারা বাস করতেন ? মঠের জীবনধারা সংক্ষেপে লেখ।

(ছ) সম্রাট ও পোপের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ কি ?

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কি বোঝ ? মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি ভাবে গড়ে ওঠে ?

৩। রচনাত্মক

(ক) পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার কি ভাবে হয় ?

(খ) শার্লামেনের অভিষেকের গুরুত্ব কি ?

(গ) শার্লামেনের শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা সম্বন্ধে কি জান ?

(ঘ) মধ্যযুগের মঠের জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(ঙ) মধ্যযুগের সম্রাট ও পোপের দ্বন্দ্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(চ) মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি ভাবে গড়ে ওঠে ? এখানে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত ? ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্ক কি রকম ছিল ?

(ছ) মধ্যযুগের দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৭ মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

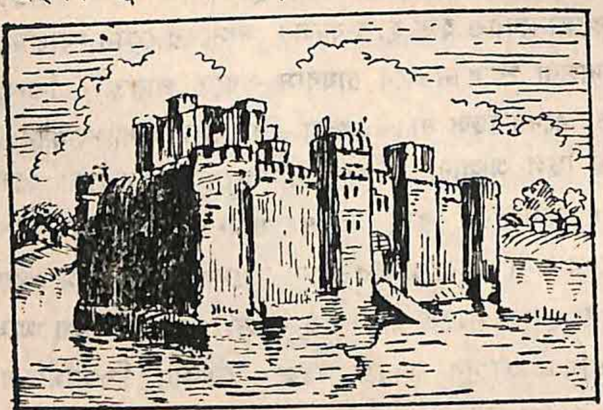
সামন্ততন্ত্র, ভূমিব্যবস্থা, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ঃ রোম সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল দাসপ্রথার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু কালক্রমে দাস-মালিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দাসরা বিদ্রোহ করে এবং রোম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক জীবনে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দাস বিদ্রোহ রোম সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। এই বিদ্রোহের ফলে রোমের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। কারণ, যে দাস-ব্যবসার ওপর ভিত্তি করে রোম সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল কালক্রমে সেই দাস-ব্যবসা অচল হয়ে পড়ে। নানান দেশ জয় করে সেইসব দেশের মানুষদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে রোমে এনে তাদের দাস বানানো হত। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে রোমের দিগ্বিজয় গেল বন্ধ হয়ে, ফলে দাসের জোগানও বন্ধ হয়ে যায়, আর দাসপ্রথাও পড়ল অচল হয়ে। যেসব দাস তখনও রোমে ছিল তাদের খাবারদাবার সংগ্রহ করাই সম্রাট ও ভূস্বামী বা দাস-মালিকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। কৃষিকার্যে সৃষ্টি হল বিশৃঙখলা। রোমের ভূস্বামী বা জমিদারদের ছিল বড় বড় জমিদারি। এই জমিদারকে বলা হত লাটিফানডিয়া। চাষবাস করত দাসেরাই। কিন্তু দাস-ব্যবসা অচল হয়ে পড়ায় বড় বড় জমিতে চাষবাস অসম্ভব হয়ে পড়ল। যে স্বল্পসংখ্যক দাস-শ্রমিক ছিল তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে না পারায় ভূস্বামীরা চাষবাসের জন্য দাস-শ্রমিকদের এক টুকরো জমি, ফসলের বীজ ইত্যাদি দেওয়ার প্রথা চালু করল। জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হবে দাস-শ্রমিকরা হবে সেই ফসল ভোগের

অধিকারী। পরিবর্তে জমিদারকে দিতে হবে শুধু কিছু ট্যাক্স বা কর। দাস ও চাষীদের নামও গেল পাল্টে। তারা এখন দাস শ্রমিক নয়, তাদের নতুন নামকরণ হল কলোন বা ভূমিদাস। কলোনদের মধ্যে জমি ভাগ করে দেওয়ার ফলে জমিদার বা দাস-মালিকদের সঙ্গে ভূমিদাসদের সম্পর্ক গেল পাল্টে। তারা এখন আর শুধু জমিদার নয়—সামন্ত-জমিদার। এই ভাবেই দাসদের জায়গায় আবির্ভাব ঘটল এমন একদল মানুষের যাদের জীবন হয়ে পড়ল জমির সঙ্গে বাঁধা। রোম সাম্রাজ্যের ভিতরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল নতুন এক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সমাজব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র বা ফিউড্যালিজম (Feudalism) নামে পরিচিত।

সামন্তশ্রেণী বিভাগ, সামন্তগণ কর্তৃক রাজকর্তৃত্ব গ্রহণঃ সামন্তপ্রথা গড়ে উঠেছিল ভূমিব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। ভূস্বামীরা কলোনদের যে জমি দিত কলোনরা ছিল সে জমির সঙ্গে বাঁধা। এই জন্যই এদের বলা হয় ভূমিদাস। জমি বিক্রির সঙ্গে সঙ্গেই কলোনদেরও হত হাত-বদল। দাসদের কোন স্বাধীনতা ছিল না, ভূমিদাসরা স্বাধীনভাবে চাষবাস করতে পারত। কিন্তু পুরো স্বাধীনতা এদের ছিল না। এজন্য এরা ছিল আধা-স্বাধীন। এদের ঘরসংসার ছিল আলাদা। কিন্তু সামন্তদের প্রতি ছিল এদের বাধ্য-বাধকতা। ফসলের কিছু অংশ সামন্তদের দিতে হত। এই ভূস্বামীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে তাদের কিছু শ্রম করতে হত। এই বাধ্যতামূলক শ্রমকে বলা হয় কর্ভি। ভূস্বামীদের মধ্যে ছিল শ্রেণীবিভাগ। তাদের সমাজ ছিল কতকটা পিরামিডের মতো। সকলের ওপরে ছিলেন রাজা, তারপরে ডিউক, কাউণ্ট ইত্যাদি। এদের নীচে ছিলেন ভাই কাউণ্ট ও ব্যারন। আর পিরামিডের একেবারে তলায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলা হত নাইট। এরা প্রত্যেকেই ছিল পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। রাজা জমি বিলিয়ে দিতেন ডিউক ও কাউণ্টদের, ডিউক ও কাউণ্টরা আবার তাদের নিজেদের

অংশ থেকে কিছু জমি বিলিয়ে দিতেন ভাই কাউণ্ট. ব্যারন—এদের মধ্যে। পরিবর্তে এদের প্রত্যেকটি শ্রেণীরই অন্য শ্রেণীর প্রতি কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল। বর্বর জাতির আক্রমণে গোটা ইউরোপ তখন বিপর্যস্ত। রোম সম্রাট ও রাজাদের পক্ষে এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগের এই অরাজক অবস্থার হাত থেকে সামন্তশ্রেণীই ইউরোপকে বাঁচিয়েছিল। ভূমিদানের পরিবর্তে সামন্তদের গ্রহণ করতে হত সেবা ও আনুগত্যের শপথ। শর্ত ছিল শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে সামন্তপ্রভুকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে এদের সাহায্য করতে হবে। 'ফিউড' শব্দটির অর্থ শর্তাধীন ভূমিদান। এই জন্যেই এই ব্যবস্থাকে বলা হয় ফিউড্যালিজম। এইসব সামন্তদের সর্বদাই সশস্ত্র সৈন্যদল প্রস্তুত রাখতে হত। প্রয়োজন হলেই এইসব সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হত রাজা ও ভূস্বামীকে।

সামন্তদুর্গ ও নাইটদের ভূমিকাঃ কৃষক বিদ্রোহ ও শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভূস্বামী ও সামন্তপ্রভুরা বাস করতেন দুর্গে। এইসব দুর্গ ছিল সুরক্ষিত। কিংবা বলা যেতে পারে



মধ্যযুগীয় দুর্গ

ভূস্বামীরা তাদের বাড়িগুলি তৈরি করতেন দুর্গের মতো করে। উঁচু পাথরের প্রাচীর দিয়ে চারদিক ঘেরা থাকত। প্রাচীর ঘিরে থাকত পরিখা। পরিখার ওপর সেতু। প্রয়োজনমাফিক এইসব সেতু পরিখার

ওপর পাতা ও তোলা হত। শত্রুরা আক্রমণ করলে এইসব দুর্গের মধ্য থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা হত। পূর্বে বলা হয়েছে, বর্বর জাতির আক্রমণ থেকে ইউরোপকে রক্ষা করার জন্য রোম সম্রাট অগাস্টাস বেশ কিছু দুর্গ তৈরি করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে এইভাবে বর্বরদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ শতকে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে রোমের সামরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। সম্রাটদের পক্ষে আর বর্বরদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। অগাস্টাস যেসব দুর্গ তৈরি করেছিলেন সেইসব দুর্গ ডিঙিয়েই জার্মানরা ঢুকে পড়ে ইতালির ভেতর। সম্রাটদের বদলে তখন এইসব সামন্ত বা ভূস্বামী বর্বররা জার্মানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। এরা যে যার নিজের এক-একটা ছোটখাটো সেনাবাহিনী গড়ে তোলে এবং ছোট ছোট দুর্গ তৈরি করে বর্বর জাতির হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করে। নিজ নিজ এলাকার সাধারণ মানুষদেরও প্রয়োজন হলে ভূস্বামীরা তাদের এইসব দুর্গে আশ্রয় দিত। এইভাবে তারা শত্রুকে হঠিয়ে দিতে সমর্থ হত। অতএব মধ্যযুগের সামন্ত দুর্গগুলির ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ।

নাইটরা ছিল সামন্তশ্রেণীর সবচেয়ে নীচু স্তরের, কিন্তু এরাও ছিল অভিজাত শ্রেণীর। অল্প বয়স থেকেই তাদের সামরিক শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। এই সময় এদের বলা হত স্কোয়ার বা কোন সুদক্ষ যোদ্ধার অনুচর। এই যোদ্ধার কাছেই এরা যুদ্ধবিদ্যা শিখত। শিখত কী করে ঘোড়ায় চড়তে হয় কিংবা বর্শা ও তলোয়ার চালাতে হয়। একুশ বছর বয়সে গুরুর কাছে দীক্ষালাভের পর এদের উপাধি হত 'নাইট'। বর্শা হাতে ঘোড়ায় চড়ে এরা যুদ্ধ করত বলে এদের বলা হত বর্শাধারী অশ্বারোহী যোদ্ধা। শত্রুর আক্রমণ থেকে ইউরোপকে রক্ষা করতে এই সময় নাইট বা বর্শাধারী অশ্বরোহীর অবদানও কম নয়। দীক্ষালাভের সময় এদের বেশ কিছু উপদেশ দেওয়া হত। গুরুর সামনে নতজানু

হয়ে এদের গ্রহণ করতে হত কয়েকটি শপথ। আর্তের সাহায্য, ধর্ম রক্ষা, স্ত্রীলোকের মানমর্যাদা বাঁচানোই ছিল নাইটদের কর্তব্য। নম্র ব্যবহার, অসীম সাহস, বীরত্ব ও বিপন্নকে রক্ষা করা—এইসবই ছিল



নাইট

নাইটদের আদর্শ। নাইটদের এই আদর্শকেই বলা হয় 'শিভাল্‌রি' বা বীরোচিত আচরণ। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে এদের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধই ছিল এদের প্রধান কাজ।

ত্রুবাদুরঃ এর আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে মধ্যযুগে ইউরোপের নানান দেশে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য বিকাশলাভ করে। এই সময়ে আবির্ভাব ঘটে ইউরোপের নানান দেশে চারণ-কবি ও গায়কদের। সেকালের ইউরোপের নানান দশে প্রচলিত ছিল এক-এক ধরনের গাথা, গল্প ও কাহিনী। চারণ-কবি ও গায়করা এই কাহিনী ও কিংবদন্তী নিয়ে শুরু করে কবিতা ও গান রচনা। ইউরোপের

নানান দেশের চারণ-কবিরা এইসব গান গেয়ে মানুষের মনে এক নতুন আমেজ সৃষ্টি করে। এর ফলে লোকসংস্কৃতিরও উন্নতি ঘটে। এইসব চারণ-কবিদের এক-এক দেশে এক-এক রকম নাম ছিল। ফ্রান্সে এদের বলা হত ত্রুবাদুর। জার্মানীতে মিনেশিঙ্গার। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল ইংলণ্ডের রাজা আর্থার ও তার নাইটদের কিংবদন্তী ও শেরউড বনের দস্যু রবিনহুডের কাহিনী। এইসব চারণ-কবিদের প্রভাবেই ইউরোপের দেশীয় সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিশেষ উন্নতি হয়।

সামন্ততন্ত্র ছিল মধ্যযুগের মানুষের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এই সামন্ততন্ত্রই মধ্যযুগের মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ধর্ম, সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো সব কিছুর ওপরেই এই সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাস-প্রথা এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যযুগের মানুষের জীবনে সামন্ততন্ত্র ছিল এক অপরিহার্য অঙ্গ।

অনুশীলনী (প্রথম পরিচ্ছেদ)

১। **বিষয়মুখী**

(ক) সামন্ততন্ত্র কাকে বলে?

(খ) ফিউড কথাটির অর্থ কি ?

(গ) কর্ভি বলতে কি বোঝ ?

(ঘ) নাইট কাকে বলে ? তাদের অস্ত্রশস্ত্র কিরকম ছিল ?

(ঙ) শিভ্যালরি বলতে কি বোঝ ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

(ক) ভূমিদাস-প্রথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ভূমিদাস কাদের বলে ?

(খ) দাস ও ভূমিদাসের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(গ) সামন্তযুগে সমাজ কিরকম ছিল ? ভূস্বামীরা কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ? কি কি ?

(ঘ) ত্রুবাদুর কাদের বলে ? এরা কি জন্মে বিখ্যাত ?

৩। **রচনাত্মক**

(ক) সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(খ) সামন্তযুগে নাইটদের ভূমিকা কি ছিল ?

ম্যানর প্রথাঃ মধ্যযুগের ভূস্বামী ও জমিদাররা বাস করতেন পাথরের দুর্গে। এই দুর্গ সমেত ভূস্বামী যে এলাকায় বাস করতেন, সেই গোটা এলাকা বা স্থানকে বলা হত ম্যানর। মধ্যযুগে এই ম্যানর প্রথা প্রচলিত ছিল। যেখানে শত্রুর ভয় বা বিপদের আশংকা কম সেইখানেই গড়ে উঠে ম্যানর হাউস বা জমিদারের বাড়ি। এই বাড়ির চারপাশে থাকত ফল ফুল আর শাকসবজির বাগান। রাস্তার দিকে থাকত জমিদার বা সামন্তদের চাকর-বাকরদের থাকবার জায়গা। এ ছাড়া আস্তাবল, গোয়াল, কামারশালা ইত্যাদি। ম্যানরের কিছু দূরে গ্রাম ও গোচারণভূমি। এরই পাশাপাশি থাকত চাষীদের জমি।

ম্যানর প্রথা—সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক দিকঃ ভূস্বামীর খামারের জমি ছিল খুব কম। কারণ আগেকার মতো বড় বড় জমিতে আর চাষবাস হত না। সব মনিবের খামারেই শস্য উৎপাদন হত। কিন্তু এই শস্য বা ফসল বিক্রী করা যেত না। চাষী যে ফসল উৎপন্ন করত, তার বেশির ভাগই চলে যেত সামন্তদের হাতে। সামন্ততন্ত্রের এই ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামোকেই বলা হয়ে থাকে সরল অর্থনীতি। বাইরে থেকে খুব কম জিনিসই আমদানী করা হত। এমন কি শিল্পজাত জিনিসপত্র তৈরি করত স্থানীয় শিল্পী ও কারিগররা। এখানে মনে রাখতে হবে যে এ সময় কুটির শিল্প ও কৃষি ছিল অভিন্ন। ম্যানরগুলি ছিল সামন্ততান্ত্রিক সরকারের এক-একটি স্থানীয় শাখা। কতকটা বর্তমানের আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো। গ্রামের লোকদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ও বিবাদ-বিসংবাদ হলে গ্রাম পঞ্চায়েত যেমন বিবাদের মীমাংসা করে ম্যানরগুলিতেও কতকটা ঠিক সেই ধরনের ব্যবস্থা ছিল। এদের ছিল নিজস্ব আদালত। কেউ কোন অপরাধ করলে ম্যানর আদালতে তার বিচার হত।

কৃষক ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থাঃ মধ্যযুগের সমাজ অর্থনীতির ভিত্তি ছিল সামন্ততন্ত্র। অতএব তার অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল ঠিক সেই ধাঁচে। আগেই বলা

হয়েছে এ যুগের অর্থনীতি ছিল সরল। যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তার সবই উৎপন্ন হত স্হানীয় এলাকায়। বাইরে থেকে জিনিসপত্র আমদানী খুব কমই করা হত। দেশবিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিনিময়ও ছিল কম। সুতরাং টাকা-পয়সার লেনদেনও বড় একটা ছিল না। এ রকম অর্থনৈতিক কাঠামোতে টাকা-পয়সায় বেতন দেওয়া সম্ভব হত না। অতএব বেতনের বদলে প্রচলিত হয়েছিল সামন্তদের জমিদানের রীতি। কৃষির উৎপাদনও ছিল খুব নিচু মানের। প্রায়শই সঠিক সময়ে ফসল ফলানো কিংবা ফসল তোলা সম্ভব হত না। কারণ যে কোন সময়েই ভূস্বামী ও মনিবরা চাষীদের তলব পাঠাত। ফসলের অধিকাংশই চলে যেত ভূস্বামীর ঘরে। ভূস্বামী ট্যাক্স বা কর হিসাবে সেই ফসল ভোগ করত। যে বছর ফসল খুব ভাল হত এমন কি সে বছরও চাষীদের ঘরে ভাত জুটত না। ফলে প্রায়ই এদের অনাহারে থাকতে হত। গ্রামে গ্রামে দেখা দিত দুর্ভিক্ষ। আর দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মহামারী বা প্লেগ। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত এইসব রোগে। গোড়ার দিকে এইসব চাষবাস হত গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়ের শ্রমে যৌথ প্রথায়। চাষীদের খাটতে হত প্রচুর। আর তাদের করও দিতে হত উঁচু হারে। ফসলের বেশির ভাগ তো কর হিসাবে এমনিতেই চলে যেত মনিবদের ঘরে। এছাড়াও প্রতিবেশী মনিব বা ভূস্বামীদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকত। যুদ্ধের সময় ভূস্বামীরা কৃষকদের রীতিমত শোষণ করত। আরও কিছু বাড়তি ফসল ট্যাক্স বা কর হিসাবে মনিবকে দিতে হত। এদিকে যুদ্ধের ফলে ফসল ও জমির বিশেষ ক্ষতি হত। সুতরাং কৃষকদের অবস্হা ছিল খুব শোচনীয়। কেবল ভূস্বামীকেই যে কর দিতে হত তা নয়, চার্চ বা গীর্জার রক্ষক বা যাজকদেরও প্রচুর কর দিতে হত।

তিনটি বিশেষ শ্রেণী—যাজক, অভিজাত ও অন্যান্যঃ সামন্তযুগে সমাজ ছিল তিনটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত। যাজক বা গীর্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে

ছিল অভিজাত আর তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল কৃষক ও ভূমিদাস। সামন্তযুগে গীর্জার প্রভাব ছিল খুব বেশী। গীর্জার প্রধান ছিলেন পোপ। পোপ ছিলেন খ্রীষ্টীয় ধর্মজগতের গুরু। পোপের অধীনে ছিল বিভিন্ন কর্মচারী। মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন পরিচালনা করাই ছিল পোপের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু ক্রমেই পোপ বা গীর্জা মানুষের পার্থিব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। অর্থাৎ মানুষের নৈতিক জীবন ছাড়াও রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারেও নাক গলাতে থাকেন। এমনকি এক সময়ে পোপ দাবি করেন যে আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বিষয় ছাড়াও রাষ্ট্রশাসনে তিনিই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। এই নিয়ে পোপ ও সম্রাটদের মধ্যে যে বিরোধ হয়েছিল তা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গীর্জা বা চার্চের ছিল এক বিশাল জমিদারি। এই জমিদারি নানান ভাবে গীর্জার অধিকারে আসে। রাজারা গীর্জাকে প্রচুর জমি দান করেন। অন্যান্য সামন্তরাও চার্চ বা গীর্জাকে জমি দেন। রাজা ও সামন্তরা গীর্জাকে জমি দান করত ধর্মীয় কারণে। কারণ পোপ তাদের বুঝিয়েছিল গীর্জাকে জমি দান করলে তারা তাদের পাপ থেকে মুক্তি পাবে। অগেই বলা হয়েছে মধ্যযুগে মানুষের জীবন ছিল ধর্মীয় নিগড়ে বাঁধা। খ্রীষ্টীয় ধর্ম সাধারণ মানুষের মনে পরলোক সম্পর্কে জাগিয়ে তুলেছিল এক নতুন আশা। সাধারণ মানুষও তাই মনে করল যে ইহজীবনের দুঃখ-দৈন্য ও হতাশা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় খ্রীষ্ট তথা ঈশ্বরের উপাসনা। পরবর্তী কালে এই ধর্মকে গীর্জা তাদের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ধর্মের আফিম খাইয়ে গীর্জা ও সামন্তরা সাধারণ মানুষকে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

সামন্তদের মতন চার্চ বা গীর্জাও কৃষকদের শোষণ করতে থাকে। অন্যান্য আয় তো এদের ছিলই. তাছাড়া কৃষকদের কাছে থেকে এরা এক ধরনের কর আদায় করত—এই করকে বলা হয় টাইথ। কৃষক তার আয়ের দশভাগের এক ভাগ নিজে রাখত। নানান ফন্দী-ফিকির এঁটে

এরা কৃষক বা চাষীদের কাছ থেকে কর আদায় করত। অথচ দরিদ্র কৃষকদের শোষণের বিনিময়ে তারা যে প্রভূত ভূসম্পত্তি লাভ করেছিল সে সব তারা ব্যয় করত নিজেদের বিলাস-ব্যসনে। গোড়ার দিকে চার্চ তার নৈতিক আদর্শ রক্ষা করলেও পরবর্তী কালে তারা আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং নানান দুর্নীতি ও ব্যভিচার চার্চের ভেতর ঢুকে পড়ে। খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করে মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর পরিবর্তে তাদের শোষণ করাই হয়ে দাঁড়ায় চার্চের প্রধান কাজ। ধর্মের নামে চলতে থাকে এক চূড়ান্ত ভণ্ডামী ও অন্যান্য অধর্ম। অথচ এরা কিন্তু বাসকরত প্রচুর জাঁকজমক ও বিলাসের মধ্যে। ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় শোষণের হাতিয়ার। চার্চের প্রধান প্রচেষ্টা হয় কিভাবে সাধারণ মানুষকে শ্রেণী-সংঘর্ষ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

দ্বিতীয় শেণীতে ছিল অভিজাতগণ। যেসব বড় বড় জমিদার ভূস্বামী ম্যানর হাউস বা দুর্গে বাস করতেন তারাই ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের জাঁকজমক আর বিলাসের অন্ত ছিল না। ম্যানরের ভেতরে ছিল প্রশস্ত খাবার-ঘর ও জমিদার অর্থাৎ ভূস্বামীদের বাসগৃহ। ম্যানর ও দুর্গে ভূস্বামীরা বাস করত বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে। মশাল ও বড় বড় মোমবাতি জেবলে ঘর আলো করা হত। চুল্লীতে ঘর গরম রাখা হত। নানান ধরনের অস্ত্রশস্ত্র যেমন বর্শা, ঢাল ইত্যাদি টাঙিয়ে রাখা হত দেওয়ালে। বর্তমান কালের মতন সুন্দর সূঁচের কাজের চমৎকার সব পর্দা তৈরি করা হত। এগুলিকে বলা হত ট্যাপেস্ট্রি। মাঝে মাঝে আয়োজন হত ভোজ ও খানাপিনার। ষাঁড়, শূকরের মাংস ছিল প্রধান খাদ্য। মদ্যপানের রীতিও ছিল, আর ছিল গান-বাজনা ও হাস্য-পরিহাসের ব্যবস্থা। ভূস্বামীরা এইসব গান-বাজনা ও হাস্য-পরিহাস বেশ উপভোগ করতেন। কৃষকদের এরা কিভাবে শোষণ করত সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কৃষক বিদ্রোহ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অভিজাত সামন্তরা বাস করতেন সুরক্ষিত দুর্গে। কিন্তু এ সত্ত্বেও কৃষক বিদ্রোহ দমন করা সব সময় সম্ভব হত না। বিদ্রোহ দমনের জন্যে অভিজাত সামন্তদের থাকত একদল সশস্ত্র

সৈন্য। রাজার সঙ্গে এইসব অভিজাত ভূস্বামীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এঁরা ছিলেন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। নিজ নিজ এলাকায় বা ম্যানরে শাসন ও বিচারে ছিল এদের চূড়ান্ত ক্ষমতা। অপরাধীর শাস্তি ছিল কঠোর। কৃষকদের সঙ্গে প্রায়ই এদের দ্বন্দ্ব লেগে থাকত এবং মাঝে মাঝেই হত কৃষক বিদ্রোহ। কিন্তু এই বিদ্রোহ খুব কম ক্ষেত্রেই সফল হত। তবে পরবর্তী কালে ভূস্বামীর পক্ষে কৃষকদের দমিয়ে রাখা আর সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল ভিলেন ও সার্ফ। যে সব কৃষক ছিল স্বাধীন তাদের বলা হত ভিলেন। এরা সামন্তপ্রভুদের জমি চাষ করত, পরিবর্তে পেত ফসলের কিছু অংশ। ভূমিদাসদের বলা হত সার্ফ। এদের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভূমিদাসদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। সামন্তপ্রভুর জমির সঙ্গে এরা ছিল বাঁধা। সামন্তপ্রভু বা ভূস্বামীর অনুমতি ছাড়া জমি ছেড়ে যাবার অধিকার এদের ছিল না। জমির সঙ্গে সঙ্গে এরাও হস্তান্তরিত হত। কিন্তু স্বাধীন কৃষক ও ভূমিদাসের মধ্যে খুব বড় একটা পার্থক্য ছিল না। ভূস্বামী ও অভিজাতদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। ভারবাহী পশুকে যে চোখে দেখা হয়, ভূস্বামী বা সামন্তপ্রভুরাও ভূমিদাস বা কৃষকদের সেই চোখে দেখত। মানুষ বলেই গণ্য করত না। এদের না ছিল কোন অধিকার, না ছিল আত্মরক্ষার কোন উপায়। এছাড়া ছিল বাধ্যতামূলক শ্রম বা কর্ভি। মধ্যযুগে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই এই প্রথা বজায় ছিল। গোড়ার দিকে অর্থাৎ দশম শতক পর্যন্ত কর্ভি প্রথার খুব পকটা চাপ ছিল না। কারণ সে সময় সামন্তপ্রভুদের চাষবাসের প্রতি বড় একটা নজর ছিল না। কিন্তু চাষীদের নানান ধরনের খাজনা ও কর দিতে হত। চাষীদের বিচারও করত ভূস্বামীরা। কোন অন্যায় করলে আদায় করত জরিমানা। এ ছাড়া আরও নানান ধরনের অত্যাচার ছিল। খেয়াল-খুশি মতো দলবল নিয়ে ভূস্বামীরা যখন-তখন শিকারের জন্য হাজির হত চাষীদের বাড়ি। ভূস্বামী ও তার দলবলের খাবারদাবারের সব

ব্যবস্থাই করতে হত চাষীদের। শিকার করতে গিয়ে অনেক সময় জমির ফসলেরও ক্ষতি হত। কিন্তু ভূমিদাসরা এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারত না। ভূস্বামীরা যে কোন সময়েই এই কর্ভি বা বেগার খাটানোর কাজে চাষীদের ডেকে পাঠাত। ফলে সময়ে ফসল ফলানো সম্ভব হত না। আর তাই ফসল উৎপাদনের মানও ছিল খুব নিচু। এই ভূমিদাস-প্রথা ছিল বংশপরম্পরাগত। মধ্যযুগে ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই বংশপরম্পরায় ভূমিসাস-প্রথা চালু ছিল।

মধ্যযুগে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই ভূমিদাসদের ওপরে চলতে থাকে অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন। চাষীদের জীবনে নেমে আসে এক চরম দুর্দশা ও দুর্গতি। রাজা, সামন্তপ্রভু ও অভিজাতদের ক্রমাগত শোষণের ফলে এদের জীবন হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ। কিন্তু জমির সঙ্গে এরা এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিল যে গোড়ার দিকে মনিবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার সাহস, শক্তি বা অধিকার কিছুই এদের ছিল না। কোন সংঘবদ্ধতাও ছিল না। আত্মরক্ষার কোন উপায় না থাকায় অসহায় দরিদ্র চাষীদের জীবন হয়ে পড়েছিল দুর্বহ। কিন্তু ধীরে ধীরে চাষীরা তাদের মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। ক্রমাগত শোষণ ও পীড়নের ফলে তাদের মনেও অসন্তোষ দেখা দেয় এবং অঙ্কুরিত হতে থাকে বিদ্রোহের বীজ। শোষণ ও পীড়নের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে এদের সাহস ও শক্তিও যায় ততটা বেড়ে। কিন্তু গোড়ার দিকে সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার থেকে মুক্তির এরা একটা খুব সহজ পথ বেছে নেয়। সে সময় ইউরোপের নানান জায়গায় গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু পবিত্র ও খ্রীষ্টীয় সংঘ। খ্রীষ্টান সাধু-সন্ন্যাসীরাই সাধারণ মানুষের সেবার জন্যে এইসব সংগঠন গড়ে তুলেছিল। বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের সেবার জন্যে রামকৃষ্ণ মিশনের মতো যে-ধরনের নানান ধর্মীয় সংগঠন রয়েছে মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় সংঘগুলিও ছিল কতকটা সেই রকম। সামন্তপ্রভুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভূস্বামীদের অনেকেই যোগ দিত এইসব

খ্রীষ্টীয় সংঘে। এ ছাড়া এ-সময় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় গড়ে উঠতে থাকে ইতালি ও ইউরোপের নানান জায়গায় ছোটখাটো অসংখ্য শহর। ভূস্বামীদের অত্যাচারে বহু চাষী তাদের জোতজমি ছেড়ে পালিয়ে এসে জড়ো হতে থাকে এইসব শহরে। এবং শহরে তখন নতুন নতুন যে সব শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠছিল সেইসব ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিভিন্ন শিল্পে নানান ধরনের কাজ জুটিয়ে কারিগরী বিদ্যা আয়ত্ত করে নেয়। আর যাদের পক্ষে কোন খ্রীষ্টীয় সংঘে যোগ দেওয়া কিংবা শহরে আশ্রয় নেওয়া বা পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না তারা ক্রমাগত ভূস্বামীদের জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে অবশেষে বাঁচার কোন উপায় না দেখে ভূস্বামী ও সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

কৃষক বিদ্রোহঃ মধ্যযুগের ইউরোপে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ হয় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি শহরে।

১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে চাষীরা ফ্রান্সের রাজা ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ 'জেকুয়ারি' বিদ্রোহ নামে অভিহিত। এই সময় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলছিল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে কৃষির চরম অবনতি দেখা দেয়। কৃষকদের জীবনে নেমে আসে এক চরম অভিশাপ। এদিকে দেখা দেয় প্লেগ নামে এক ভয়ংকর মড়ক। এই মড়কে গোটা ইউরোপে প্রায় ২ কোটি লোক মারা যায়। চাষবাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে অভুক্ত শোষিত কৃষকদের পক্ষে বিদ্রোহ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু রাজা ও সামন্তপ্রভুরাও এই বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হয়। এমনকি বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ কিছুদিন বন্ধ রাখে। কৃষকদের সঙ্গে যোগ দেয় প্যারির নাগরিকেরাও। বণিক ও কারিগরদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে কৃষকরা প্যারির রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। শহর ও গ্রামের বিদ্রোহ এখন

সংঘবদ্ধভাবে বয়ে চলে একই খাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা ও সামন্ত-প্রভুরাই জয়ী হয়। বিদ্রোহীদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ ছিল। যাদের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল তারা কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভূস্বামীদের পক্ষে যোগ দেয়। সুতরাং বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। কিন্তু ব্যর্থ হলেও ভূস্বামীদের পক্ষে চাষীদের ভূমিদাস করে রাখা আর সম্ভব হয়নি। ধীরে ধীরে ভূস্বামীরা ভূমিদাসদের স্বাধীনতা দিতে থাকে। ফ্রান্সের কৃষক বিদ্রোহের প্রায় ২৫ বছর পরে ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে এক কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে দেখা দিয়েছিল এক ভয়ংকর মারী বা মড়ক। এই মড়কই ইতিহাসে 'ব্ল্যাকডেথ' নামে পরিচিত। এই মড়কের ফলে গোটা দেশ প্রায় জনশূন্য হয়। জনৈক ঐতিহাসিক এই মড়কের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেনঃ 'দেশের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে গ্রাম পড়িয়া আছে কিন্তু লোকজনের বাস নাই। ক্ষেতে পশুরা ইচ্ছামত চরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের রাখাল নাই। কোন মাঠে হয়ত ফসল পাকিয়া আছে কিন্তু কাটিয়া আনিবার মানুষ কোথায়? কোথাও ক্ষেত পড়িয়া আছে, চাষী নাই, কে চাষ করিবে? কে বীজ বুনিবে?'

মড়কের পরেই ইংল্যান্ডে দেখা দিল এক চরম অরাজকতা। জমিদাররা চাষবাসের জন্য দরিদ্র চাষীদের ওপর শুরু করে দিল নির্মম জুলুম ও অত্যাচার। অথচ দেশে তখন চাষী-মজুরের রীতিমতো অভাব। চাষী ও মজুররা তাই শ্রমের বিনিময়ে দাবি করল বেশী মজুরির। জমিদাররা বেশী মজুরি দিতে অস্বীকার করল এবং গোঁ ধরল, মড়কের আগে যে মজুরি ছিল সেই মজুরিতেই কাজ করতে হবে। এমন কি দেশের আইনসভা বা পার্লামেণ্টকে দিয়ে একটা আইনও পাশ করিয়ে নিল। পার্লামেণ্টে ছিল ধনী ও জমিদারদের প্রভাব। সুতরাং পার্লামেণ্টও এদের প্রভাবে চাষী ও মজুরদের সেই একই মজুরিতে কাজের হুকুম জারী করল। চাষীরা দাবি জানাল কর্ভি ও দাসপ্রথা বাতিল করতে হবে। মড়কের আগের

হারেও মজুরি দেওয়া চলবে না। আর যেসব জোতজমি জমিদাররা অন্যায়ভাবে দখল করছে সেসব তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। এই শর্তে রাজা ও জমিদাররা গররাজী হলে কৃষকরা বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন ওয়াট টাইলার নামে জনৈক কারিগর। এদিকে এই বিদ্রোহে ইন্ধন জোগাল ললার্ড নামে এক সম্প্রদায়। ইংল্যান্ডের পশম শিল্পে ললার্ডদের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। শহরে শিল্পী ও মজুরদের নানান দাবিদাওয়া নিয়ে এরা প্রায়ই আন্দোলন করত এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রচার করত। ললার্ডদের প্রচার ও বক্তৃতা চাষী-মজুরদের বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে।

১৩৮১ সালে ইংল্যান্ডে শুরু হয়ে গেল এক জোরদার কৃষক বিদ্রোহ। এই সময়ে ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন রিচার্ড। প্রায় লাখখানেক মানুষ এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল ইংল্যান্ডের একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত। বিদ্রোহী কৃষকরা এসে সমবেত হল ব্ল্যাকহিল নামক এক স্থানে। এরপর ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন আক্রান্ত হল। আগুন জ্বলল দোকান-বাজারে। লুঠ হল ধানের গোলা ও খাদ্যশস্য। জেলখানার গরাদ ভেঙে বেরিয়ে এল শয়ে শয়ে বন্দীরা। রাজা প্রমাদ গুনলেন। বিদ্রোহীদের প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু ঠিক সেই সময় ঘটল এক অঘটন। ওয়াট টাইলার রাজার এক বন্ধুর হাতে নিহত হলেন। ফলে বিদ্রোহীরা আবার গর্জে উঠল। এবারে রাজা লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদ্রোহী কৃষকদের মার্জনা করলেন, এবং বললেন, তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। পরিবর্তে বিদ্রোহীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। কিন্তু বিদ্রোহ যে একেবারে ব্যর্থ হল তা নয়। এই বিদ্রোহের ফলে ইংল্যান্ডের জমিদাররা বেশ খানিকটা ভয় পেয়ে গেল। কৃষক ও শ্রমিকদের মজুরিও তারা বাড়িয়ে দিল। তারা ভূমি পেল এবং স্বাধীন কৃষকের মর্যাদা লাভ করল। মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপের

প্রায় সব দেশেই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে এরকম কৃষক ও মজুরদের বিদ্রোহ প্রায় লেগেই ছিল।

অনুশীলনী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। **বিষয়মুখী**

(ক) 'ম্যানর' কাকে বলে?

(খ) সামন্তযুগে তিনটি বিশেষ শ্রেণী কি ছিল?

(গ) পোপ কাকে বলে? তাঁর প্রধান কাজ কি?

(ঘ) ইউরোপে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ কোথায় হয়? এই বিদ্রোহ কি নামে অভিহিত?

(ঙ) ওয়াট টাইলার কে? তিনি কেন বিখ্যাত?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

(ক) ম্যানর প্রথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(খ) মধ্যযুগে কৃষকদের অবস্থা কিরকম ছিল?

(গ) অভিজাতরা কিভাবে জীবন যাপন করতেন?

(ঘ) মধ্যযুগে কৃষকরা কেন বিদ্রোহ করেছিল? এই বিদ্রোহ কেন সফল হয়নি?

(ঙ) ফ্রান্সের জেকুয়ারি বিদ্রোহ সংক্ষেপে লেখ।

৩। **রচনাত্মক**

(ক) মধ্যযুগে সামন্তদের জীবন যাপন সংক্ষেপে লেখ।

(খ) মধ্যযুগে কৃষক ও জনসাধারণের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(গ) ইংলণ্ডে কৃষক বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বিদ্রোহের ফল কি হয়েছিল?

---

৮ ধর্মযুদ্ধ (প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ)

আরবদের কাছ থেকে তুর্কীরা ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরের অধিকার কেড়ে নেয়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মভূমি প্যালেস্টাইনও তারা দখল করে। বিধর্মী তুর্কীদের হাত থেকে খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান উদ্ধার করাই ছিল ধর্মযুদ্ধের আপাত উদ্দেশ্য কিন্তু খ্রীষ্টানদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মযুদ্ধের অজুহাতে প্রাচ্যের বাণিজ্য-পথগুলি দখল করা। কারণ ভূমধ্যসাগরীয় পথেই ইউরোপের সঙ্গে প্রাচ্য দেশগুলির বিশেষত ভারতের বাণিজ্য চলত। এই ধর্মযুদ্ধকেই বলা হয় ক্রুসেড্। কিন্তু ধর্মযুদ্ধ ছিল একটা অজুহাত। এই সময় ইতালিতে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠছিল। এইসব শহরের বণিকেরাই ছিল ধর্মযুদ্ধের আসল উদ্যোক্তা। কারণ এরাই টাকা-পয়সা দিয়ে ধর্মযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল। এই যুদ্ধের মাধ্যমে ভারত ও প্রাচ্যের বাজার দখল করাই ছিল এদের আসল উদ্দেশ্য। তবে বিধর্মী মুসলমানদের হাত থেকে খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান পোপ এই ধর্মযুদ্ধে বিশেষ উদ্‌যোগী হন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিনি খৃষ্টানদের প্ররোচিত করেন এবং জোর প্রচার চালান। ঘোষণা করেন যারা ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবে তাদের স্বর্গরাজ্য লাভ হবে। আর যারা যোগ দেবে না তাদের স্থান হবে নরকে। এইভাবে ধর্মের নাম ভাঙিয়ে খ্রীষ্টানরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইউরোপে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সূচনা করে। প্রায় দুশো বছর ধরে এই ধর্মযুদ্ধ চলেছিল।

প্রথম ধর্মযুদ্ধ: প্রথম ধর্মযুদ্ধ শুরু হয় ১০৯৫ সালে। ছয় লক্ষ পদাতিক ও একলক্ষ অশ্বারোহী এই ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে। ইউরোপের নানান দেশের সৈন্যরা এসে কনস্টানটিনোপলে সমবেত হয়। সেখান থেকে পূর্ব দিকে এগিয়ে এন্টিয়োক নামে এক শহর

দখল করে এবং শহরে লুটপাট করে বহু লোককে হত্যা করে, প্যালেসটাইন দখল করে নেয় এবং কতকগুলি সামন্ত-রাজ্য স্থাপন করে। কৃষকরা নির্মমভাবে শোষিত হয়।

প্রথম ধর্মযুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বেশি লাভবান হয় ইতালীর বণিকরা। ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি যেসব ছোটখাট শহর ইতালিতে গড়ে উঠেছিল, সেইসব শহরের বণিকরা ধর্মযুদ্ধে জাহাজ ভাড়া দিয়ে এবং জাহাজের মালপত্র আত্মসাৎ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু খ্রীষ্টানদের জেরুজালেম দখল চিরস্থায়ী হয় নি। মুসলমানরা পুনরায় তা দখল করে নেয়।

তৃতীয় ধর্মযুদ্ধঃ মোট আটটি ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এদের মধ্যে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল ১১৮৭ সালে। এই সময় তুর্কী সুলতান ছিলেন সালাদীন। সালাদীন জেরুজালেম দখল করেন। ফলে ইউরোপের খ্রীষ্টানরা পুনরায় ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস এবং জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবরসা। এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এঁরা জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক জলে ডুবে মারা যান। তাঁর সৈন্যদল জার্মানিতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রাজা রিচার্ড ও ফিলিপের মধ্যেও শীঘ্রই দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ফলে ফিলিপ ফ্রান্সে ফিরে যান। রিচার্ড একাকী ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করেন। তুর্কী সুলতান সালাদীন ও রাজা রিচার্ড দুজনেই ছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা এবং উদারহৃদয়। উভয়েই উভয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। কথিত আছে যুদ্ধকালীন রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে সালাদীন তার নিজের চিকিৎসক ও পথ্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর একবার যুদ্ধে রিচার্ডের ঘোড়া মারা গেলে সালাদীন তাঁকে একটি আরবী ঘোড়া উপহার পাঠান। কিন্তু দুবছর যুদ্ধ করেও রিচার্ডের পক্ষে জেরুজালেম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত সালাদীনের সঙ্গে

তাঁকে সন্ধি করতে হয়। এই সন্ধি অনুসারে স্থির হয় যে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা ইচ্ছামতো জেরুজালেম নগরে যাতায়াত করতে পারবে। সালাদিন স্বয়ং রিচার্ডকে জেরুজালেম পরিদর্শন করতে বলেন কিন্তু রিচার্ড রাজি হন নি। ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি অস্ট্রিয়ার রাজা ষষ্ঠ হেনরির হাতে বন্দী হন। কিছুকাল পরে মুক্তি পেয়ে তিনি দেশে ফিরে যান।

চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ হয় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এই যুদ্ধে বিশেষ কোন ফল হয়নি। ধর্মযুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য ভুলে ধর্মযোদ্ধারা কনস্টানটিনোপল অধিকার করে এবং এই শহর লুঠপাঠ করে। কিন্তু মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করা খ্রীষ্টানদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শহরটি তুর্কীদের হাতে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজ সেনাপতি অ্যালেনবি তুর্কীদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করেন।

সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ধর্মযুদ্ধের প্রভাবঃ ধর্মযুদ্ধের প্রভাবের কথা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। ধর্মযুদ্ধের ফলে ইতালির নতুন-গড়ে-ওঠা শহরগুলির হাতে প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চিত হয়। ইতালির বণিক, সামন্ত এবং পোপ স্বয়ং প্রচুর ধন লাভ করে। প্রাচ্যের নানান দেশ থেকে জাহাজ-বোঝাই লুণ্ঠিত ধনরত্ন ইউরোপে আসে। এছাড়া প্রাচ্যের নানান শিল্পদ্রব্যেও ইউরোপের বাজার ছেয়ে যায়। কেবল ইতালির শহরগুলি নয় ইউরোপের নানান দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে কাঁচামাল আমদানি করে ইউরোপ সিল্ক, কার্পেট, মখমল ইত্যাদি নূতন শিল্প গড়ে তোলে এবং এইসব শিল্পদ্রব্য ভারত ও প্রাচ্যের নানান দেশে রপ্তানি করে। ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক অর্থ বিনিময় হয়। টাকা হয়ে ওঠে এখন বিনিময়ের মাধ্যম। টাকার মাধ্যমেই এখন থেকে জিনিসপত্র কেনাবেচা শুরু হয়। ভূস্বামী জমিদার ও সামন্তদের রুচিও যায় বদলে। গতানুগতিক সামন্ত্রতান্ত্রিক ধাঁচে এরা আর জীবনযাপন করতে চায় না। ধর্ম-

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রেরও দিন ফুরিয়ে এসেছিল। প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে নানান বিলাসদ্রব্য ইউরোপে আসায় সামন্তরাও এক নতুন জীবনের স্বাদ পায়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাত্রার পদ্ধতি বদলে যায়। এখন থেকে তারা রীতিমতো বিলাসী হয়ে ওঠে। প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে সংযোগে ইউরোপের সংস্কৃতি বিশেষ পুষ্ট হয়।

নতুন শহর ও ব্যবসায়-কেন্দ্রঃ পূর্বে বলা হয়েছে মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে বিশেষত ইতালিতে অনেক নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। এইসব শহরের মধ্যে বিখ্যাত ছিল ফ্লোরেন্স, জেনোয়া ও ভেনিস। ধর্মযুদ্ধ কালে প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং ধর্মযুদ্ধের জাহাজ ভাড়া দিয়ে এই শহরগুলি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। ইতালির এই গড়ে-ওঠা শহরগুলি ছিল ধর্মযুদ্ধের প্রকৃত সংগঠক। ভূমধ্য-সাগরীয় পথে ভারত ও প্রাচ্য দেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার দখল করাই ছিল এদের আসল উদ্দেশ্য। এইভাবে ইতালির শহরগুলি এই সময় ইউরোপের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কৃষি ও কুটির শিল্প (একাদশ-দ্বাদশ শতক)ঃ দশম ও একাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে কোন শহর বা নগর ছিল না বললেই চলে। সামন্ত-প্রভুরাও বাস করতেন সুরক্ষিত দুর্গে। এই দুর্গের কাছাকাছি অঞ্চলেই হাটবাজার বসত ও কেনাবেচা চলত। শহর না থাকায় কুটির শিল্পেরও তেমন বিকাশ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে কৃষি ও কুটির শিল্প ছিল অভিন্ন। সমাজে তখনও কামার, কুমোর, কারিগর প্রভৃতি ছিল কিন্তু কুটির শিল্প তখনও কৃষি থেকে স্বতন্ত্র হয় নি। যে লোক কৃষির কাজ করত সে-ই বাড়িতে বসে নানান জিনিসপত্র তৈরি করত। কিন্তু একাদশ শতক থেকে এই পরিস্থিতি যায় বদলে। প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ইতালির শহরগুলির হাতে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে এই সময় থেকে শুরু হল নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার ও বিভিন্ন শিল্পে তার

প্রয়োগ। প্রাচ্য দেশগুলি থেকে কাঁচামাল আমদানি হয়। ফলে বেশ কিছু নতুন শিল্প গড়ে ওঠে। কামার, কুমোর, কারিগর এখন এক-একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হয়। ফলে কুটির শিল্প কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমাজে দেখা দেয় শ্রমবিভাগ। সমাজজীবনে এই শ্রমবিভাগের বেশ বড় একটা সুফল দেখা যায়। কারণ এই শ্রমবিভাগ থেকেই শহর তৈরির সূত্রপাত হয়। কুটির শিল্পই এখন থেকে হয়ে পড়ে শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিল্পী ও কারিগররা এখন থেকে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে বসেই বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করে। তাদের যন্ত্রপাতি ছিল খুব সাধারণ। উৎপাদনের রীতিও ছিল গতানুগতিক। কিন্তু শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। দীর্ঘকাল একই ধরণের কাজ করায় শিল্পী ও কারিগররা এই দক্ষতা অর্জন করে। কুটির শিল্পী এখন নিজেই তার উৎপাদনের যন্ত্রপাতির মালিক। কাঁচামালও সে নিজেই সংগ্রহ করে। এইভাবে শিল্পদ্রব্য তৈরি করে শিল্পী কারিগররা এখন থেকে সরাসরি খরিদ্দারের কাছে বিক্রী করতে থাকে। এখন থেকে তাই শহরের কারিগর ও কুটির শিল্পীরা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সামন্তযুগের ভূমিদাস ও কৃষকদের মতন জমিদার কিংবা ভূস্বামীর কাছে তাদের হাত-পা বাঁধা রাখতে হয় না। কিন্তু এই কারিগররাও আবার হয়ে পড়ে এক-একজন শোষক। তাদের অধীনে যেসব শিক্ষানবীশ থাকত তাদের শ্রমকে এরা নানান ভাবে শোষণ করতে থাকে।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী

(ক) প্যালেস্টাইন কিজন্য বিখ্যাত ?

(খ) ধর্মযুদ্ধ কাকে বলে ?

(গ) প্রথম ধর্মযুদ্ধ কত সালে হয় ?

(ঘ) সালাদিন কে ? তিনি রিচার্ডকে কি উপহার দিয়েছিলেন ?

(ঙ) কুটির শিল্প কাকে বলে ? কৃষি থেকে কুটির শিল্প কখন বিচ্ছিন্ন হয় ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

(ক) ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

(খ) ধর্মযুদ্ধে কে উদ্যোগী হয়েছিল ?

(গ) প্রথম ধর্মযুদ্ধে খ্রীষ্টানরা কোন কোন শহর দখল করে ?

(ঘ) এই ধর্মযুদ্ধে কারা বেশি লাভবান হয় এবং কিভাবে ?

(ঙ) তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে কোন কোন দেশের রাজা যোগদান করেন ? সন্ধিতে কি স্থির হয় ?

৩। রচনাত্মক

(ক) ধর্মযুদ্ধের কারণগুলি সংক্ষেপে লেখ।

(খ) সংক্ষেপে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ বর্ণনা কর।

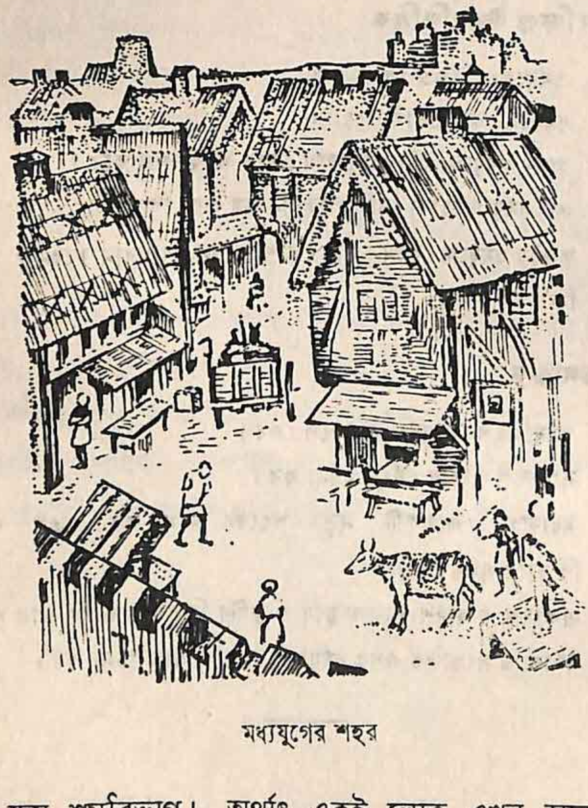
(গ) মধ্যযুগের কয়েকটি নতুন শহরের নাম কর। এই শহরগুলি কিভাবে সমৃদ্ধ হয় ?

(ঘ) একাদশ ও দ্বাদশ শতকে কৃষি ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে কি জান ?

(ঙ) সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ধর্মযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা কর।

৯ শহরের উদ্ভব

পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপের নানান দেশে গড়ে ওঠে ছোট ছোট শহর। কিন্তু কিভাবে এই শহরগুলি গড়ে উঠেছিল তা আমাদের জানা দরকার। একাদশ শতক থেকে কৃষি ও কুটির শিল্প পৃথক হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে



মধ্যযুগের শহর

দেখা দেয় শ্রমবিভাগ। অর্থাৎ একই লোক এখন আর সব কাজ করে না। যে কৃষক সে শুধু চাষের কাজই করে। শিল্পদ্রব্য তৈরি করার জন্য গড়ে ওঠে আর একটা বিশেষ শ্রেণী। এই শ্রেণীকেই

বলা হয় শিল্পী ও কারিগর। শ্রমবিভাগ সামাজিক দিক থেকে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরাট অগ্রগতি। ঐতিহাসিকরা বলেন শ্রমবিভাগের এই ধাপ থেকেই গড়ে উঠেছে মধ্যযুগীয় শহর। ভূস্বামী ও সামন্তদের দুর্গ ও ম্যানরের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যযুগের ইউরোপের শহরগুলি গড়ে উঠেছিল সামন্তদের এইসব দুর্গকে কেন্দ্র করে। সামন্তরা তাদের নিজ নিজ ম্যানরের এলাকাভুক্ত স্থান প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিত ও বণিক শ্রেণীর উদ্ভবের পর তারা ভূস্বামী ও সামন্তপ্রভুদের প্রাচীরবেষ্টিত এলাকায় নিজ নিজ উৎপাদিত পণ্য বিক্রী শুরু করে। গোড়ার দিকে এইসব শিল্পী ও বণীকেরা ছিল ভ্রামামাণ। কিন্তু পরে তারা স্থায়ীভাবে এইসব সুরক্ষিত দুর্গ এলাকায় বসতি গড়ে তোলে । এক-এক শিল্পী ও কারিগর খুলে বসে এক-এক ধরনের হস্তশিল্পের কারখানা। সামন্তের ম্যানর এলাকাভুক্ত প্রাচীরবেষ্টিত এইসব স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মধ্যযুগীয় শহর। কিন্তু এ ছাড়াও মধ্যযুগে শহর গড়ে ওঠার আর একটা কারণ ধর্মযুদ্ধ।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ভূমিকাঃ মধ্যযুগীয় ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ধর্মযুদ্ধের প্রভাব ও ফলাফল পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটে ত্রয়োদশ শতকে। ধর্মযুদ্ধের ফলে বিশেষভাবে লাভবান হয়েছিল ইতালির নতুন-গড়ে-ওঠা শহরগুলি। পোপ, ভূস্বামী ও ইতালি এইসব শহরের বণিকরাই ছিল ধর্মযুদ্ধের পরিচালক। ধর্মযুদ্ধের শেষে প্রচুর সম্পত্তি এদের হাতে চলে আসে। ধর্মযুদ্ধের সৈনিকদের এরা যেসব জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছিল সেইসব জাহাজে ভর্তি প্রাচ্যদেশগুলির লুণ্ঠিত ধনসম্পদ এদের হাতে এসে পেঁছয়। এইসব ধনরত্নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সোনাদানা, দামী পাথর, সিল্ক ও হাতির দাঁতের কাজ। এ ছাড়া ছিল মসলাপাতি। ধর্মযুদ্ধের ফলে কেবল ইতালির শহরগুলি নয় ইউরোপের অন্যান্য শহরেও শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। প্রাচ্য দেশ থেকে এখানে কাঁচামাল আমদানী করার সুবিধে হওয়ায়

গড়ে ওঠে নতুন শিল্প ও ব্যবসা। এইসব শিল্পের মধ্যে সিল্ক, কার্পেট ও মখমল ছিল বিখ্যাত।



নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলি ও তার ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর ধর্মযুদ্ধের আর একটি বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ধর্মযুদ্ধের ফলেই ইউরোপে অর্থ বিনিময়ের ব্যাপক প্রচলন হয়। মধ্যযুগের গোড়ার

দিকে টাকার প্রচলন তেমন ছিল না। কিন্তু এখন অর্থ বা টাকাই হয়ে দাঁড়ায় বিনিময়ের মাধ্যম। টাকার বিনিময়েই এখন থেকে সব লেনদেন ও কেনাবেচার কাজ চলতে থাকে। ভূস্বামী ও সামন্তদের রুচিও যায় বদলে। প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় তাদের জীবনে আসে বিলাস-ব্যসনের নতুন আস্বাদ। সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচে জীবন যাপন এখন তাদের কাছে হয়ে ওঠে নিতান্তই একঘেয়ে। ফলে, তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতিতেও আসে আমূল পরিবর্তন। ধর্মযুদ্ধ ইউরোপের সামন্তপ্রথার অবসানের সূত্রপাত করে। সামন্ত ও ভূস্বামীদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই সূত্রপাত ঘটে।

গিল্ড বা বণিক ও শিল্পী সংঘঃ গিল্ড শব্দটির অর্থ সংঘ। মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপে শহর গড়ে ওঠার পর বণিক ও শিল্পীরা ঐক্যবদ্ধভাবে যে সংগঠন গড়ে তুলেছিল সেই সংগঠন বা সংঘকেই বলা হয় গিল্ড। ইউরোপের বণিকেরাই প্রথম এই গিল্ড গড়ে তোলে। মধ্যযুগের নগরজীবনে গিল্ডের বিশেষ ভূমিকা ছিল। গিল্ড গড়ে তোলার রীতি প্রথম চালু হয় ইংল্যান্ডে। ধীরে ধীরে সারা ইউরোপেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে গিল্ডের রেওয়াজ চালু হয়। কিভাবে এই গিল্ড গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস বেশ চিত্তাকর্ষক। বণিকরা এক দেশ থেকে মাল নিয়ে যেত অন্য দেশে। কিন্তু পথেঘাটে ছিল দস্যু তস্করের ভয়। সুতরাং বণিকরা যাতায়াত করত সংঘবদ্ধ হয়ে। বণিকদের এই সংঘবদ্ধতা থেকেই গিল্ডের প্রচলন। সংঘের নিরাপত্তার জন্য রাখা হত এক-একটি ছোটখাট সেনাবাহিনী। প্রথমদিকে যে কোন বণিকই তার ইচ্ছেমতো গিল্ডে যোগদান করতে পারত কিন্তু পরে গিল্ডের নিয়মকানুন অনেক বদলে যায়।

গিল্ডের কার্যকলাপঃ গিল্ডের প্রধান কাজ ছিল বণিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করা। গোড়ায় সবাই গিল্ডে যোগ দিতে পারত। কিন্তু পরে কেবল যারা বিত্তশালী তাদেরই গিল্ডের সভ্য হওয়ার

আইন চালু হয়। চালু হয় আরও নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ। প্রথমত, সপ্তাহে কোন্ কোন্ দিন কেনাবেচা হবে গিল্ডই তা স্থির করত। দ্বিতীয়ত, কোন দস্যুর দ্বারা কোন বণিকের সম্পত্তি লুঠ হলে কিংবা অন্য কোন ভাবে তার মালপত্র নষ্ট হলে কিংবা সে অসুস্থ হয়ে পড়লে গিল্ড থেকে সেই বণিককে অর্থসাহায্য দেবার রীতি চালু হয়। তৃতীয়ত, ভূস্বামী ও সামন্তদের সঙ্গে কর ও শুল্ক-সংক্রান্ত যা কিছু আলোচনা সবই চলত গিল্ডের মাধ্যমে। চতুর্থত, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনেও গিল্ডের ছিল প্রধান ভূমিকা। গিল্ডের সাধারণ সভায় একটি কাউন্সিল গঠন করা হত। কেবল নির্বাচিত ব্যক্তিদেরই এই কাউন্সিলের সভ্য হবার অধিকার ছিল। পঞ্চমত, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেও গিল্ডের ছিল বিশেষ প্রভাব। গিল্ডের সভ্যদের মার্জিত ও নৈতিক জীবন যাপন করতে হত। মাঝে মাঝে নানান আমোদ-প্রমোদ উৎসবেরও আয়োজন করত গিল্ড। গিল্ডের নিয়ম ভঙ্গ করলে সভ্যদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত, জরিমানা করা হত।

শিল্পী কারিগররাও বণিকদের মতো সংঘ গড়ে তোলে। কিন্তু এই সংঘ গড়ে ওঠে আরও অনেক পরে দশম শতকে। শ্রমবিভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও প্রসার ঘটে এবং শিল্পীদেরও নানান ধরনের সংঘ গড়ে ওঠে। শিল্পীদের এই সংঘকে বলা হত কর্পোরেশন। শিল্পীদের এই সংঘেও বণিক সংঘের মতোই নানান কঠোর নিয়ম-কানুন ও বিধি-নিষেধ চালু হয়েছিল।

নাগরিক জীবনঃ মধ্যযুগের শহরের উদ্ভব কিভাবে ঘটে ইতিপূর্বে তা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের শহর ও নগরগুলির সঙ্গে এসব শহরের অনেক পার্থক্য। এই শহরগুলি ছিল বর্তমানের তুলনায় খুব ছোট। প্রতিটি শহরই ছিল প্রাচীর-ঘেরা। এই প্রাচীরের কয়েকটি জায়গায় ছিল প্রবেশদ্বার। শহরের রাস্তাঘাট ছিল সরু ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখনকার মতো রাস্তায় ঝলমলে আলো দেওয়ারও

কোন ব্যবস্থা ছিল না। গ্যাসের আলোরও তখন আবিষ্কার হয়নি। বেশির ভাগ পথঘাটই ছিল কাঁচা। বাড়িগুলি তৈরি হত ঘেঁষাঘেঁষি করে। পরিবেশও ছিল অস্বাস্থ্যকর। জলনিকাশ কিংবা আবর্জনা বা ময়লা সাফ করার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। বাজার ছিল শহরের প্রধান কেন্দ্র। বাজারে থাকত নানান ধরনের দোকানপসার। কিন্তু এখনকার মতন দোকানে দোকানে কোন সাইনবোর্ড বা নাম-ফলক থাকতো না। তার বদলে টাঙিয়ে রাখা হত ব্যবসা অনুযায়ী এক-এক ধরনের নমুনা। যেমন দোকানের সামনে জুতো টাঙিয়ে রেখে বোঝানো হত যে এটা মুচির দোকান। প্রত্যেক শহরেই ছিল বেশ কিছু সরাইখানা—এখন যেরকম হোটেল বা রেস্তোরাঁ। বাইরে থেকে যেসব লোকজন আসত তারা এইসব সরাইখানায় বাস করত। ভারতেও মধ্যযুগে এরকম বেশ কিছু সরাইখানা ছিল। সম্রাট শেরশাহ অসংখ্য সরাইখানা তৈরি করেছিলেন। এখনকার মতো শহরে মাঝে মাঝে মেলা বসত। বেচাকেনা হত নানান ধরনের জিনিসপত্রের।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে মধ্যযুগের শহরগুলি গড়ে উঠেছিল অধিকাংশই বণিক, শিল্পী ও কারিগরদের উদ্যোগে, সুতরাং শহরের অধিকাংশ অধিবাসীর জীবিকা ছিল শিল্প ও ব্যবসা। এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল বলে শহরে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী নাগরিকদেরই বসবাস ছিল। ছিল বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ, যেমন কামার, ছুতোর, স্বর্ণকার, তাঁতী ইত্যাদি। এই শিল্পের বেশির ভাগই হস্ত ও কুটির শিল্প। কারণ যন্ত্রপাতির আবিষ্কার তখনও হয়নি। কিন্তু শিল্পী ও কারিগররা ছিল খুব সুদক্ষ। অধিকাংশ শহর ও নগরগুলি ছিল জমিদার ও সামন্তদের অধীন। যে সামন্তদের অধীনে যত বেশী শহর তার শুল্ক ও করও তত বেশি। বণিক ও ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে মুনাফা করত তার বেশির ভাগই চলে যেত এইসব জমিদার ও সামন্তদের হাতে। সামন্তদের এই লোভ মধ্যযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বণিকরা

তাই মাঝে মাঝে চেষ্টা করত প্রয়োজনবোধে শহরকে সামন্তদের কবল থেকে মুক্ত করতে।

রাজকীয় সনদ দ্বারা নাগরিক স্বায়ত্তশাসনঃ বেশির ভাগ নগরেই ছিল নাগরিক সংগঠন—বর্তমান কালে যেরকম মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশন। শহর ও নগরের পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিকদের সুখ-সুবিধা বজায় রাখাই ছিল এই সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব। প্রত্যেক নগরেই থাকতেন একজন নগরাধ্যক্ষ বা মেয়র। এর পরেই ছিলেন নগরকর্তা বা অল্ডারমেন। এঁরা খুব জাঁকজমকের মধ্যে বাস করতেন। যে রাজা বা সামন্তর অধীনে যে শহর ছিল সেসব রাজা বা জমিদারদের কাছ থেকে নাগরিকরা নগরের স্বায়ত্ত-সংক্রান্ত অধিকার আদায় করতেন। রাজা বা জমিদার একটি কাগজে এই অধিকারগুলি লিখে দিতেন। এগুলিকে বলা হত চার্টার বা রাজকীয় সনদ। এই সনদের জোরে প্রত্যেক শহর ও নগর তৈরি করত তার নিজস্ব আইন-কানুন, কর ও শুল্ক আদায়-সংক্রান্ত আইন এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য প্রচলন করত নিজস্ব মুদ্রা। এই সনদের জোরেই মধ্যযুগের নগরগুলি প্রাচীন গ্রীসের মতোই পরিণত হয়েছিল এক-একটি নগর-রাষ্ট্রে। এইসব নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে ভেনিস ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

বুর্জোয়া শব্দের উৎপত্তিঃ মধ্যযুগের শহরগুলির বেশিরভাগই গড়ে উঠেছিল বণিক শিল্পপতি ও বড় বড় টাকাওয়ালা লোকদের অর্থে ও আনুকূল্যে। এইসব বণিক ও শিল্পপতিদেরই বলা হয় বুর্জোয়া। ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই ভাবেই গড়ে ওঠে। নাগরিক জীবনে এইসব বুর্জোয়া মধ্যবিত্তদের ছিল এক বিশেষ ভূমিকা। বর্তমান কালে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বুর্জোয়াদের যে প্রাধান্য প্রতিপত্তি ও যেভাবে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে এদের প্রাধান্যও ছিল কতকটা সেইরকম। বুর্জোয়ারা ছিল স্বাধীন ও স্বনির্ভর। সামন্ত ও যাজকদের মধ্যযুগীয় জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এদের

বিশেষ কোন মিল ছিল না। বাইবেল ও মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি এরা ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টের স্বর্গসুখে এদের মোটেই কোন আস্থা ছিল না। ইহজীবনের ভোগসুখই ছিল এদের একমাত্র কাম্য বস্তু। মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপের সমাজ ও অর্থনীতিতে এই বুর্জোয়ারা এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এ পর্যন্ত সমাজ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ছিল সামন্তপ্রভুদের হাতে। কিন্তু এই সময় থেকে সমাজ অর্থনীতির সব চাবিকাঠি চলে আসে এই মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াদের হাতে। সমাজে বুর্জোয়াদের এই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি এবং মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন থেকেই শুরু হয়েছিল ইউরোপীয় নবজাগরণ।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী

(ক) শ্রমবিভাগ বলতে কি বোঝ ?

(খ) প্রাচ্যের লুণ্ঠিত ধন কিভাবে ইউরোপকে পৌছয় ?

(গ) গিল্ড কাকে বলে ?

(ঘ) মধ্যযুগের নগরগুলি কিরকম ছিল ?

(ঙ) 'চার্টার' কাকে বলে ? চার্টারের প্রয়োজন হয়েছিল কেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

(ক) শিল্পী ও কারিগর কাদের বলে ? এদের কাজ কি ?

(খ) মধ্যযুগের শেষে কিভাবে টাকার মাধ্যমে লেনদেন হয় ?

(গ) গিল্ড প্রথা কেন প্রচলন হয় ?

(ঘ) মধ্যযুগের নগর সম্পর্কে কি জান ?

(ঙ) 'বুর্জোয়া' শব্দটির অর্থ কি ? মধ্যযুগের শেষভাগে বুর্জোয়াদের ভূমিকা কি ছিল ?

৩। রচনাত্মক

(ক) মধ্যযুগের শহরগুলি কিভাবে গড়ে ওঠে ?

(খ) গিল্ডের কার্যকলাপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(গ) মধ্যযুগের নাগরিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(ঘ) রাজকীয় সনদ দ্বারা মধ্যযুগের শহরগুলি কিভাবে স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছিল ?

১০ মধ্যযুগে চীন ও জাপান

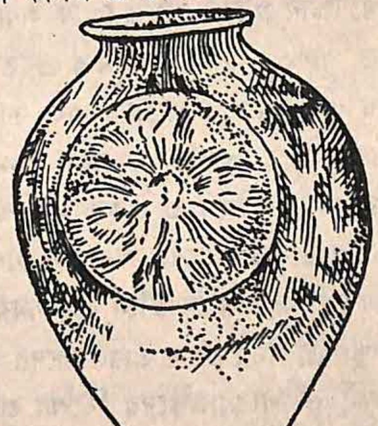
তাঙ যুগ (৬১৮-৯০৭ খ্রী)

চীনে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে চীনে হান নামে এক বংশ রাজত্ব করত। এই বংশের পতনের পর থেকে প্রায় চারশত বৎসরকাল চীনে এক বিশৃঙ্খলার যুগ চলে এবং হূন, তাতার প্রভৃতি জাতি চীন আক্রমণ করে। এদের অধিকাংশই ছিল যাযাবর। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা সভ্য হয়ে ওঠে এবং যাযাবরবৃত্তি ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ঠিক এই সময়ে চীনে শুরু হয় তাঙ্ বংশের শাসন। ৬১৮ থেকে ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ—এই দীর্ঘ তিনশত বছর ধরে তাঙ্ বংশের রাজত্ব চলে।

চীনের ঐক্য ও আইন-সংকলনঃ তাঙ্ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন তাই সুঙ্ (৬২৭-৬৫০ খ্রীঃ)। তাই সুঙ্ ছিলেন ভারত সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। তাঁর আমলেই বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ ভারতে আসেন। তাই সুঙ্ তাতারদের চীন থেকে তাড়িয়ে দেন এবং চীনের ঐক্য ফিরিয়ে আনেন। এইটিই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। শুধু ঐক্য নয়, তাই সুঙের রাজত্বকালে চীনের শান্তি ও শৃঙ্খলাও ফিরে আসে এবং চীন সভ্যতা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। এই কারণে তাঙ্ যুগকে বলা হয় 'চীনের স্বর্ণযুগ' এবং তাঁর অসাধারণ কীর্তির জন্য তাই সুঙ্ অভিহিত হন 'মিং হুয়াং' বা গৌরবময় সম্রাট নামে। তাই সুঙের আমলে তুর্কিস্তান, তিব্বত, আনম এবং কিরঘিজ পর্যন্ত চীনসাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। তাঁর পুত্র কোরিয়া জয় করে কোরিয়াকে একটি করদ রাজ্যে পরিণত করেন। তাই সুঙের আমলে চীনের আইনকানুন সংকলন করা হয়। শোনা যায় একদিন তাই সুঙ্ কারাগার পরিদর্শন করতে যান এবং প্রায়

তিনশ জন মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে এই শর্তে ছেড়ে দেন যে তাদের চাষবাসের কাজ শেষ করে তারা আবার ফিরে আসবে। প্রত্যেক অপরাধী তার কথা রেখেছিল। ফলে তাই সুঙ্ সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ছেড়ে দেন এবং এই নিয়ম করেন যে, ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে প্রাণদন্ড দিতে হলে সম্রাট তার আগে তিনদিন অনশন করবেন। সম্রাটের বিশ্বাস ছিল যে এই আইনের ফলে কেউ অন্যায়ভাবে দন্ডিত হবে না।

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিঃ তাঙ্ যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের জন্য বিশেষ স্মরণীয়। এই সময়ে শিক্ষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। তাঙ্ যুগেই চীনে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। বারুদ ও কাগজের মুদ্রার আবিষ্কারও এই যুগের অন্যতম কীর্তি। তাঙ্ যুগে রাজ্য চালাত আমলারা। সরকারী আমলাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই যুগে গড়ে ওঠে বিখ্যাত হানলিন বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে চীনের ইতিহাস লেখা হত



তাঙ শিল্প
(চীনামাটির পাত্র)

এবং চীনের পুরনো পুঁথিপত্র নকল করে প্রকাশ করা হত। হাজার হাজার পুরনো ও দুর্মূল্য পুঁথিপত্রের সংগ্রহের জন্য তাঙ্ যুগ বিখ্যাত হয়ে আছে। কাব্য রচনাতে এ যুগের জুড়ি নেই। এ যুগের সর্বাপেক্ষা যশস্বী ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন লি-পো। অতুলনীয়

মৃৎশিল্পের জন্য তাঙ্ যুগ বিখ্যাত। সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র তৈরিতে এ যুগের মৃৎশিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছে। চা-পানের প্রথারও এ যুগে বিশেষ প্রসার হয়।

কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যঃ তাঙ্ যুগে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। দেশে প্রচুর ফসল ফলত। ফলে খাদ্যের কোন অভাব ছিল না। নানান দেশের সঙ্গে এই সময়ে চীনের সংযোগ ঘটায় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে। বাণিজ্যে উন্নতির ফলে চীন হয়ে ওঠে ঐশ্বর্যশালী। শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসায় এবং অভাব-অভিযোগ না থাকায় জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকে। ঘরবাড়ি তৈরি ও পোশাক-পরিচ্ছদে চমৎকার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

চীনে বৌদ্ধধর্মঃ ধর্মের দিক থেকে চীন সম্রাটরা ছিলেন উদার। তাঙ্ যুগে চীনে নানা দেশের নানা ধর্মের লোকের আনাগোনা ছিল। মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের লোক অবাধে তাদের নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করতে পারত। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ তাই সুঙের কাছে এক ধর্মদূত পাঠান। এবং তাই সুঙ্ চীনের ক্যান্টন শহরে মুসলমানদের একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন। খ্রীষ্টানরাও একটি গীর্জা ও একটি মঠ স্থাপনের অনুমতি পায়। তাই সুঙ্ চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়ে পাঠ করেন ও খুশি হন। এইভাবে দেখা যায় যে চীনে এই সময় নানান ধর্মের লোকেরা আসত। কিন্তু এই সময় চীনে ভারতীয়দের আসা-যাওয়া ছিল বেশি ও বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পরিব্রাজকদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। তাঙ্ যুগে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বহু চৈনিক ভিক্ষুক বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলন ও সংগ্রহের জন্য ভারতে আসেন। হিউয়েন সাঙ্ ছিলেন এঁদের অন্যতম।

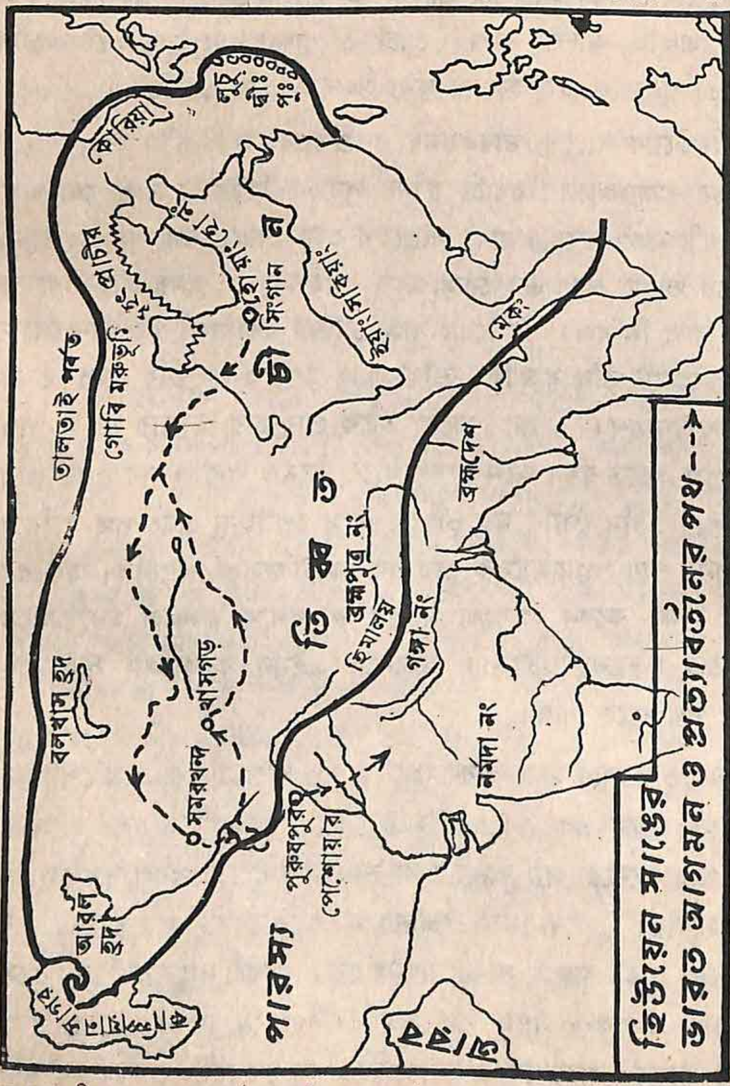
চীন সভ্যতার প্রসারঃ পূর্বে বলা হয়েছে তাঙ্ যুগে চীন সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। তুর্কীস্তান, তিব্বত, আনাম,

কোরিয়া প্রভৃতি দেশ এই সময়ে চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এইসব দেশে চীন সভ্যতা প্রসারিত হয়। জাপানীরাও চীন সভ্যতা সম্পর্কে এই সময়ে উৎসুক হয়ে পড়ে এবং চীন সভ্যতার অনেক কিছু গ্রহণ করে জাপানে প্রচলন করে। বস্তুতঃ তাঙ্ যুগে চীন ছিল একটি আদর্শ রাষ্ট্র। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানান দেশ চীন সভ্যতা গ্রহণ ও অনুকরণের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল।

হিউয়েন সাঙের ভারতভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তনঃ চীন সম্রাট তাই সুঙের রাজত্বকালে বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন ও বুদ্ধের বাণী সংগ্রহের জন্য ভারতে আসেন। হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। সে সময় চীনে বিদেশ যাত্রা ছিল নিষিদ্ধ। হিউয়েন সাঙ্ চীনের রাজধানী চাং আন থেকে পায়ে হেঁটে তাঁর সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রায় বের হন। তাঁর বয়স তখন আঠাশ-ঊনত্রিশ। এখান থেকে তাঁকে প্রায় চার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। অনেক দেশ ঘুরে, অনেক পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অবশেষে তিনি গোবি মরুভূমিতে এসে পৌঁছান এবং পথ হারিয়ে ফেলেন। প্রায় সপ্তাহখানেক তার এক ফোঁটা জলও জোটেনি। হিউয়েন সাঙ্ লক্ষ্য করেন অসংখ্য মানুষ ও পশুর কঙ্কাল মরুভূমিতে ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো। অবশেষে এইসব কঙ্কালের সাহায্যেই তিনি পথ খুঁজে পান।

মরুভূমি পার হয়ে আরও অনেক পথ ঘুরে তিনি এসে পৌঁছান পিং শান নামে এক পর্বতের নিচে। এই পার্বত্যপথে চলবার সময় তাঁর প্রায় পনেরো জন অনুচর বা ভারবাহী ঘোড়া প্রবল তুষারপাতে প্রাণ হারায়। তিনি নিজে কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে পর্বত পার হন এবং এক তুর্কী রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এঁরই সাহায্যে তিনি এসে পৌঁছান সমরকন্দ নামে এক শহরে। এখানে তিনি অনেক খবর সংগ্রহ করেন। অবশেষে এখান থেকে এসে পৌঁছান ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কপিশা নগরে। এইভাবে হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ শুরু হয়। হিউয়েন সাঙ্ প্রায় দীর্ঘ ১৬ বছর ভারতে ছিলেন।

অবশেষে ভারত থেকে অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং বুদ্ধের পবিত্র বাণী সংক্রান্ত অসংখ্য দুর্লভ পুঁথি সংগ্রহ করে তিনি দেশে ফিরে যান। হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি পরবর্তী কালে লেখেন তাঁর বিখ্যাত ভারত-বিবরণ। এই বিবরণ থেকে আমরা



তৎকালীন ভারতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারি। হিউয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণের ফলে ভারত ও চীনের মধ্যে

মৈত্রী সুদৃঢ় হয়। ভারত ও চীনের মধ্যে এক চমৎকার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটে।

সুঙ্ যুগ (৯৬০-১২৮০)

তাই-সুঙের পর তাং বংশের শাসন খুব বেশি কাল টেকেনি। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের গোড়ায় তাং বংশের পতন ঘটে। তাং বংশের পতনের পর চীনের সিংহাসন নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল কয়েকটি পরিবারের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলে। অবশেষে ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে শুরু হয় সুঙ্ বংশের শাসন। চীনের ইতিহাসে পুনরায় শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। এসময়ও চীন বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এবারে চীন আক্রমণ করে মঙ্গোল নামে এক জাতি। পরবর্তী কালে এদেরই বংশধররা মোগল নামে পরিচিত হয় এবং ভারতে সাম্রাজ্য স্হাপন করে। মঙ্গোলরা চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল আক্রমণ করে এবং উত্তর চীনের এক বিশাল অংশ জয় করে নেয়।

গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা: রাষ্ট্রকর্তৃক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিঋণ: কিন্তু তা সত্ত্বেও চীনে সুঙ্ যুগে নানাদিকে বিশেষ উন্নতি হয় এবং নানান বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। সুঙ্ রাজারা ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও সুন্দর জীবনের পক্ষপাতী। রাজ্যজয় অপেক্ষা বৈষয়িক সমৃদ্ধির প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক দেখা যায়। সুঙ্ রাজারা ছিলেন প্রজানুরঞ্জক ও জনকল্যাণকামী। জনসাধারণের সুখ-সুবিধার প্রতি এদের বিশেষ নজর ছিল। একটি জনকল্যাণমূলক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলাই ছিল এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যবসা-বাণিজ্য তার নিজের হাতে তুলে নেয়, জিনিসপত্রের দরদাম বেঁধে দেয় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানান

বিধিনিষেধ জারী করে। আস্থাসূচক মুদ্রার প্রচলন হয়। কৃষির উন্নতি, কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি এ যুগে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। সুদখোর মহাজন ও সামন্তদের শোষণ থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য এবং চাষবাসের সুবিধার জন্য রাষ্ট্র কৃষকদের কৃষিঋণ দেওয়ার প্রথা প্রচলন করেন। দরিদ্রদের বিনামূল্যে শস্য বিতরণ করা হয়। এছাড়া যে বছর প্রচুর ফসল ফলত সে বছর রাষ্ট্র সব ফসল কিনে নিত এবং দুর্ভিক্ষ ও অসময়ের বৎসরের জন্য তা জমিয়ে রাখত। চীনে সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে একজন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন শাসকের আবির্ভাব ঘটে। এঁর নাম ওয়াং-আন্ শী। দীর্ঘ আঠারো বৎসর তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর আমলে চীনে নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার ঘটে। সম্পত্তির ওপরে কর ধার্য করা হয়। এইভাবে চীন সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলে।

শিক্ষা-সংস্কৃতিঃ সুঙ্ রাজারা ছিলেন তাং রাজাদের মতোই শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সুঙ্ আমলে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল রদবদল ঘটে। রদবদল ঘটেছিল প্রধানমন্ত্রী ওয়াং-আন্ শী-র প্রচেষ্টায়। সাহিত্য ও কাব্যচর্চাতেও প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হয়। সুঙ্ যুগের শিল্পকলা ছিল যথেষ্ট মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন। তাং যুগের মতো এ যুগেও মৃৎশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে। চিত্রশিল্প বিশেষত প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাবলী এ যুগের এক বিরাট বিস্ময়।

প্রায় তিনশো বছর ধরে সুঙ্ রাজারা চীনে রাজত্ব করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আবার চীনের বিপদ ঘনিয়ে আসে। মঙ্গোলরা ইতিমধ্যেই চীনের ভাবধারা গ্রহণ করেছিল এবং উত্তর চীনের এক বিশাল অংশ অধিকার করে নিয়েছিল। এরপর পীত নদী পেরিয়ে আসে মাঞ্চুরা। সুঙ্ রাজারা এইসব বহিঃশত্রু আক্রমণের প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার ও উদাসীন। তাঁরা সাহিত্য-শিল্পে মগ্ন

থেকে, কবিতা লিখে, ছবি এঁকে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতেন। মঙ্গোল নেতা চেঙ্গিস খাঁর পদধ্বনি তখনো তাদের কানে পৌঁছয়নি।

ইউয়ান যুগ (১২৮০-১৩৬৮)

মঙ্গোলদের কথাঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতকের মাঝামাঝি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ই ফ্রান্সে শার্লামেন, বাগদাদে হারুণ অল রশিদ, ভারতে হর্ষবর্ধন এবং চীনে তাই সুং রাজত্ব করতেন। এঁরা সকলেই ছিলেন সমসাময়িক, দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক। এঁদের শাসনকালে তাই এইসব দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। কিন্তু এঁদের মৃত্যুর পর থেকে প্রায় তিনশ বছর ধরে আবার শুরু হয় এক বিশৃঙ্খলার যুগ। শার্লামেনের মৃত্যুর পরে ফ্রাঙ্ক রাজ্য ভেঙে পরে। তুর্কীজাতিরা পূর্ব রোমক সামাজ্যে হানা দেয়। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ঐক্যে চিড় খায়। এদিকে চীনে তাং বংশের পর থেকে শুরু হয় পুনরায় বিদেশী আক্রমণ। আক্রমণ এসেছিল মঙ্গোল নামে এক জাতির কাছ থেকে। মঙ্গোলদের নেতা ছিলেন দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খান।

মঙ্গোল জাতিও ছিল যাযাবর। সাইবেরিয়ার বৈকাল হ্রদের কাছাকাছি অঞ্চলে ছিল এদের বসতি। চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে তাতার জাতির সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলে এরা একযোগে চীন আক্রমণ করে। ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে পিকিং অধিকৃত হয়। কিছুকালের মধ্যেই তুর্কীস্থান আফগানিস্তান, পারস্য এবং রাশিয়াও মঙ্গোলরা দখল করে। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। চেঙ্গিস কেবল একজন বিখ্যাত যোদ্ধাই

ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন সুশাসক। ইলিউ চুতসাই নামে জনৈক চীনা পণ্ডিত ছিলেন তাঁর পরামর্শদাতা। চেঙ্গিসের মৃত্যুর পরে চুতসাই তাঁর পুত্র ওগদাই খাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ওগদাই সমগ্র চীন জয় করেন। রুশ দেশও অধিকৃত হয়। ওগদাইয়ের মৃত্যুর পরে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাধে। অবশেষে ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কুবলাই খাঁঃ সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই কুবলাই ছিলেন মঙ্গোল সাম্রাজ্যের চীনা অংশের শাসক। চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সিংহাসনে আরোহণ করাই তিনি তাঁর রাজধানী কারাকোরাম থেকে পিকিংএ সরিয়ে আনেন। এখান থেকেই তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেন। কুবলাই খাঁর শাসনকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তাঁর আমলেই



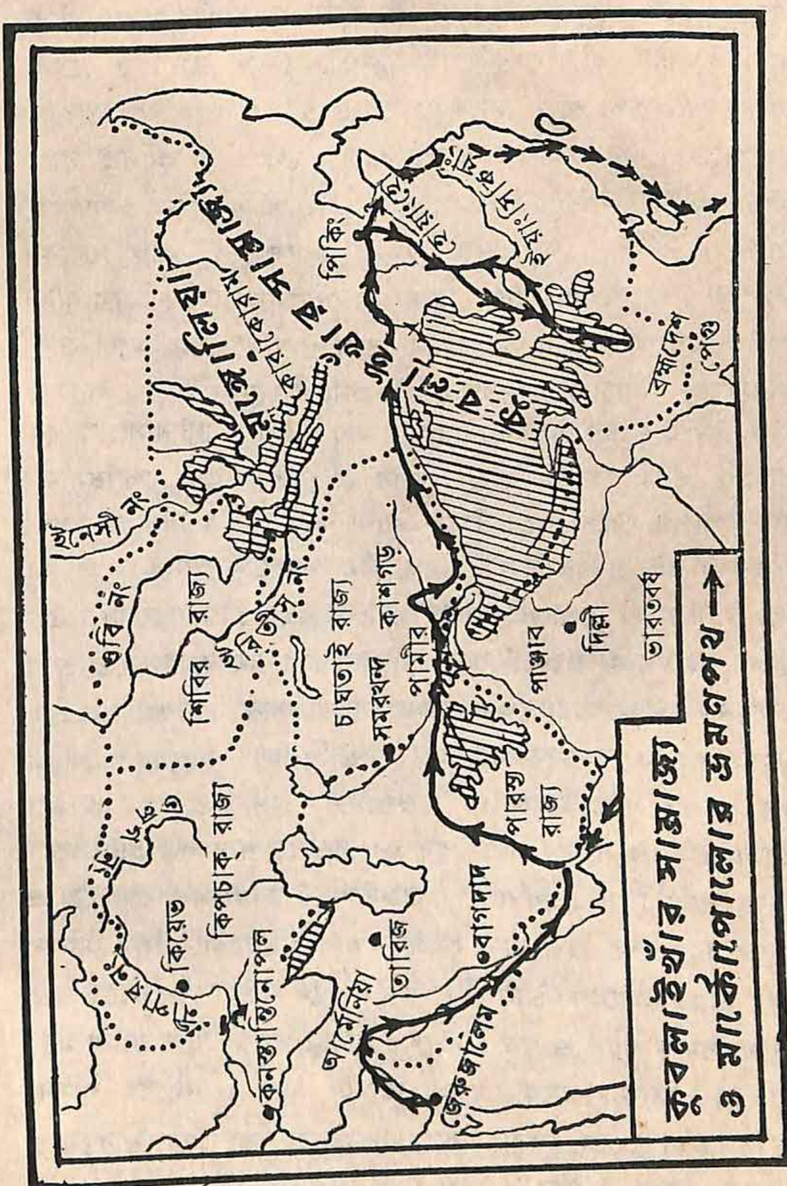
কুবলাই খাঁ



মার্কোপোলো

বিখ্যাত পর্যটক মার্কোপোলো চীন ভ্রমণে আসেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। মঙ্গোলরা তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। নিষ্ঠুর ও নৃশংস হলেও ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন উদার ও সহিষ্ণু।

মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্তঃ পোলোরা ছিলেন ইতালির ভেনিস শহরের বণিক ও দুই ভাই। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়ে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এ'রা এসেছিলেন রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরের


চেংগিস খাঁর সাম্রাজ্য ও মার্কোপোলোর ভ্রমণপথ ⟶
ইনেসী নং
ওবি নং
শিবির রাজ্য
চাঘতাই রাজ্য
সমরখন্দ
কাশগড়
পামীর
পাঞ্জাব
দিল্লী
ভারতবর্ষ
পারস্য রাজ্য
বাগদাদ
তাব্রিজ
আর্মেনিয়া
জেরুজালেম
কনস্তান্তিনোপল
কিয়েভ
কিপচাক রাজ্য
পিকিং
ব্রহ্মদেশ
পেগু

তীরে। এইখানেই কুবলাই খাঁর কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরা মার্কোপোলোকে চীন ভ্রমণে উৎসাহিত করেন। কুবলাই খাঁর কথা শুনে মার্কোপোলোও চীন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে পড়েন। অবশেষে কুবলাইয়ের দরবারে পেঁছিলে, কুবলাই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ইউরোপীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কুবলাই অনেক তথ্য জেনে নেন পোলোদের কাছ থেকে। অবশেষে পোপের প্রতি বাণী বহন করে পোলোরা দেশে ফিরে যান। কুবলাই পোপকে অনুরোধ করেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে ভাব-বিনিময়ে ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য শ-খানেক পণ্ডিত পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু অনেক টালবাহানার পরে মাত্র দুজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীকে পাঠানো হয়। কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত চীনে পেঁছিননি। মার্কোপোলো দেশে ফিরে গিয়ে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনী। এই ভ্রমণকাহিনী থেকে চীন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়। পোলোরা দীর্ঘ ষোলো বছর চীনে ছিলেন। এই ষোলো বছরের অভিজ্ঞতা মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় রাজধানী পিকিং ছিল এক চমৎকার শহর। সমচতুষ্কোণ, আয়তনেও বিশাল। নগরের মাঝখানে ছিল কুবলাই খাঁর জমকালো রাজপ্রাসাদ। সোনা-রুপোয় মোড়া। এছাড়া ছিল এক সুন্দর বাগান, হ্রদ এবং বড় বড় প্রাসাদ ও অট্টালিকা। পিকিং শহর ছিল ঐশ্বর্যশালী। রাজদরবারে জাঁকজমক, জৌলুস ও আড়ম্বরের অন্ত ছিল না। কুবলাই খাঁর রাজদরবারে ছিল নানান গুণী ব্যক্তির সমাবেশ। চীন ছিল শস্য সম্পদে পূর্ণ। দেশ জুড়ে ছিল অসংখ্য সমৃদ্ধ শহর ও গ্রাম। দেশের নানান স্থানে ছিল বৌদ্ধ মঠ। প্রায় বছর তিনেক মার্কোপোলো ছিলেন হ্যাংচাও নগরের শাসন-কর্তা। চীন থেকে ফেরার পথে পোলোরা কিছুদিন ভারতবর্ষে কাটান। ভারত সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য আমরা মার্কোপোলোর ভ্রমণকাহিনী থেকে জানতে পারি।

অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। **বিষয়মুখী**

(ক) তাঙ্ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ?

(খ) মিঙ্ হুয়াং কথাটির অর্থ কি ?

(গ) প্রথম ছাপাখানা চীনে কখন স্থাপিত হয় ?

(ঘ) চীনের কোন শহরে মুসলমানরা মসজিদ তৈরি করেছিল ?

(ঙ) হিউয়েন সাঙ কখন ভারতে আসেন ?

(চ) ওয়াঙ-আন-শী কে ?

(ছ) চেঙ্গিস খাঁ কে ছিলেন ?

(জ) কুবলাই খাঁ কত সালে সিংহাসনে বসেন ?

(ঝ) মার্কোপোলো কে ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

(ক) তাই স্থঙ কিভাবে চীনের ঐক্য ফিরিয়ে আনেন ?

(খ) কারাগার পরিদর্শন করতে গিয়ে তাই স্থঙ কি করেছিলেন ?

(গ) তাঙ যুগে চীনে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা কি রকম ছিল ?

(ঘ) কোন্ কোন্ দেশে চীন সভ্যতার প্রসার ঘটে ?

(ঙ) স্থং যুগে চীনে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান ?

৩। **রচনাত্মক**

(ক) তাই স্থঙের রাজত্বকালকে কেন চীনের স্বর্ণযুগ বলা হয় ?

(খ) হিউয়েন সাঙ্ কিভাবে ভারতে আসেন ?

(গ) স্থঙ্ রাজারা প্রজাকল্যাণের জন্য কি করেছিলেন ?

(ঘ) স্থঙ্ আমলে শিক্ষা-সংস্কৃতি কি রকম ছিল ?

(ঙ) মঙ্গোলদের সম্বন্ধে কি জান ?

(চ) কুবলাই সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

(ছ) মার্কোপোলোর ভ্রমণকাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

মধ্যযুগে জাপান

মধ্যযুগে জাপানের সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিঃ চীনের মতো জাপানও এক প্রাচীন দেশ। এর আরেক নাম দাই নিপ্পন বা উদিত সূর্যের দেশ। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত কতকগুলি বড় এবং কয়েক হাজার ছোট দ্বীপের সমষ্টি নিয়ে জাপান গঠিত। এই দ্বীপগুলির মধ্যে হোক্কাইডো. হনসু ও কিয়োসু হল প্রধান। এক সময় উত্তরে কামচাটকা ও শাখালিন থেকে দক্ষিণে প্রায় ফরমোজা পর্যন্ত জাপানের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল।

জাপান তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পেয়েছে চীনের কাছ থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে জাপানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক পার্থক্য। অতি প্রাচীনকাল থেকে জাপানের রাষ্ট্রকাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক। ষোড়শ শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সঙ্গে জাপানের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন পর্তুগীজ জাপানে আসে। ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিসস জেভিয়ার নামে জনৈক জেসুইট ধর্মযাজক জাপানে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। জেসুইটের বিবরণ থেকে জানা যায় যে জাপানে সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই ছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সঙ্গে এই যোগাযোগে গোড়ায় জাপানের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জাপানে বিদেশী প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত দীর্ঘ দুই শতক ধরে জাপানের সঙ্গে বহিঃপৃথিবীর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। এই সময়ে জাপানে পুরোপুরি সামন্তপ্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন কাল থেকেই জাপানে সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল পিতৃতান্ত্রিক। গোটা জাপান বিভক্ত ছিল কয়েকটি দল বা গোষ্ঠীতে। এই দল বা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়শ লেগেই থাকত। সম্রাট ছিলেন এই গোষ্ঠী বা দলের প্রধান নেতা কিন্তু গোষ্ঠীর ক্ষমতার উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠী বা দলের ওপর তার নিয়ন্ত্রণও বাড়ত কমত। এই পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি

লাভের জন্য ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে এক সংস্কারের চেষ্টা হয় এবং চীনা ধাঁচে এক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

জাপানী সমাজ ছিল দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—শাসক ও শাসিত। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে শাসকশ্রেণী গঠিত ছিল। দ্বাদশ শতক থেকে এইসব পদ হয়ে পড়ে বংশানুক্রমিক। সরকারও হয়ে পড়ে শ্রেণীভিত্তিক। সরকারী কর্মচারীদের জীবনধারণের জন্য ধানজমি দেওয়ার রেওয়াজ চালু ছিল। বাকি ধানজমিগুলি ভাগ করে দেওয়া হত প্রজাদের মধ্যে। অভিজাত ও সরকারী কর্মচারীদের কোন কর দিতে হত না। কিন্তু সাধারণ প্রজাদের কর দিতে হত। ফলে কিছুকালের মধ্যে সরকারী কর্মচারী বা আমলারা প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়। এইভাবে সমাজে উদ্ভব ঘটে এক বিশেষ সুবিধা-ভোগী ধনী শ্রেণীর। এই ধনবান শ্রেণীদের হাতেই রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। সম্রাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে এই ধনবান শ্রেণীরাই হয়ে ওঠে অধিকতর শক্তিশালী।

সম্রাট বা মিকাডোঃ জাপানী শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন মিকাডো বা সম্রাট। দেবতাদের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে গণ্য করা হত। প্রথমে তার ক্ষমতা ছিল অসীম। কিন্তু পরবর্তী কালে তার ক্ষমতা হ্রাস পায়। জাপানের প্রচলিত ধর্মকে বলা হত শিণ্টো। মিকাডো বা সম্রাট ছিলেন এই শিণ্টো ধর্মের প্রধান পুরোহিত। শিণ্টোধর্মে দেশপ্রেম ও ভগবানের প্রতি ভক্তিকে সবচেয়ে ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। দেশকে ভালবাসো এবং ভগবানকেও ভক্তি করো—এই ছিল শিণ্টো ধর্মের প্রধান উপদেশ। ফলে জাপানীরা গোড়া থেকেই ছিল দেশপ্রেমিক। দ্বাদশ শতক থেকে জাপানের সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তিনি নামেমাত্র শাসকে পর্যবসিত হন। জাপানের ধনীক শ্রেণী তার সব ক্ষমতা কেড়ে নেয়। এখন থেকে কিয়োটোর রাজপ্রাসাদে তিনি প্রায় নির্বাসিত জীবন যাপন করতে থাকেন।

জাপানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এই কাঠামোই

জন্ম দিয়েছিল সামরিক ও বেসামরিক—এই দুই শ্রেণীর শাসক-গোষ্ঠীর। বেসামরিক শাসকশ্রেণী সম্রাট ও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত। সামরিক গোষ্ঠী কর্তৃত্ব করত প্রদেশগুলির উপর। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং প্রধানত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এই সামরিক শাসকগোষ্ঠীর ওপর। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জাপানে এইভাবে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ হয়।

ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সামন্তদের নেতৃত্বে জাপানের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হয়। এই সামন্ত নেতাদের বলা হত দায়মিয়ো। দ্বাদশ শতকের শেষভাগ থেকে সম্রাট প্রকৃতপক্ষে এই দায়মিয়ো বা সামন্তপ্রভুদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েন এবং তাঁর সব ক্ষমতা এই দায়মিয়োর হাতে তুলে দেন। এখন থেকে জাপানের সব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই চলে যায় শোগানদের হাতে। শোগানরাই এখন থেকে হলেন জাপানের প্রকৃত শাসক। এই শোগানদের মধ্যে হিদেওসি ও আয়েযাসু ছিলেন বিখ্যাত। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে আয়েযাসু শোগান নিযুক্ত হন। এই সময় থেকে ১৮৬৭ সাল অর্থাৎ প্রায় সুদীর্ঘ আড়াইশো বছর জাপানের ক্ষমতা ছিল শোগানদের হাতে। শোগানরা জাপানের এক বিশেষ সুবিধাভোগী পরিবার বা গোষ্ঠী। এদের বলা হত তকুগাওয়া শোগান। এই সময়ে জাপানের অন্যান্য গোষ্ঠী ও পরিবার তকুগাওয়া শোগানদের চেয়ে ছিল অনেক বেশি দুর্বল। ফলে এদের পক্ষে জাপানের সব ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। শোগানরাই প্রকৃত পক্ষে ছিল দেশের শাসক। কিন্তু তারা দেশ শাসন করতেন সম্রাটের নামে। তকুগাওয়া শোগানরা ক্ষমতায় এসে তাদের বিরোধীদের সব ক্ষমতা কেড়ে তাদের নিজেদের সমর্থক ও বশংবদদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। যে সব ধনী ও অভিজাত শ্রেণী তাদের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের জোতজমি রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু যারা খুব শক্তিশালী, বিদ্রোহের ভয়ে তাদের জোতজমি কেড়ে নিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হয়। নিজ পরিবারের স্বার্থ ও

সুবিধা রক্ষার জন্য শোগান বা তাদের পুরুষানুক্রমিক গোষ্ঠী পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহকে জিইয়ে রাখে। জাপানের অনেক পরিবার ও গোষ্ঠীই তখন তকুগাওয়াদের একচ্ছত্র শাসনের বিরোধী ছিল। কিন্তু এরা নিজেরা এত বেশি রকম গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহে বিব্রত ছিল যে ঐক্যবদ্ধভাবে শোগানদের কুশাসনের বিরুদ্ধে লড়তে পারেন নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোগানদের এই একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটে। প্রথম তিন প্রধান শোগানের মৃত্যুর পর শোগানদের ব্যক্তিগত ক্ষমতাও হ্রাস পায় এবং পরবর্তী শোগান উচ্চতর ও নিম্নতর পরিষদের হাতের পুতুল হয়ে পড়ে। শোগানদের পরেই ছিল দায়মিয়োদের স্থান। এরা ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তা। এদের ক্ষমতার প্রধান উৎস ছিল সামুরাই। সামুরাইরা জাপানের যোদ্ধৃশ্রেণী। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কমোডর পেরী যখন জাপানে পৌঁছন, জাপানের প্রকৃত শাসনক্ষমতা তখন ছিল এই সামুরাইদের হাতে। সামন্তপ্রভুদের স্বার্থরক্ষা ও দেশরক্ষা এই দুটোই ছিল সামুরাইদের প্রধান কাজ। জাপানে এই সময়ে টাকাকড়ির প্রচলন ছিল না, বিনিময়ের মাধ্যম ছিল চাল। দায়মিয়ো ও সামুরাইদের এই চালের মাধ্যমেই বেতন দেওয়া হত। জাপানে এই সময়ে প্রচলিত প্রবাদ ছিল—একজন কৃষক দুজন সামুরাইয়ের সমান। কৃষি ও চাষবাস সম্পর্কে জাপানীরা ছিল খুব উৎসাহী। কিন্তু কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। কৃষকরা ছিল সামুরাইদের জন্য চাল উৎপাদনের এক যন্ত্র বিশেষ।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে চীন থেকে। কিন্তু চীন ও জাপান এই দুই দেশই নিজেদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করে। জাপানের প্রচলিত ধর্ম ছিল শিণ্টো। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের পর শিণ্টো ধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানী শাসকরা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বিশেষত সাধারণ মানুষের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল খুব বেশি। প্রাচীন জনগণের মতো জাপানীরাও ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী।

তকুগাওয়াদের আমলে বৌদ্ধসংঘগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সপ্তদশ থেকে ঊনিশ শতক পর্যন্ত অস্ত্রশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কনফুসীয় নীতি ও শিক্ষা সামুরাইদের জীবনের বিশেষ অঙ্গ হয়ে ওঠে।



জাপানের বুদ্ধমূর্তি

কিন্তু জাপানীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে পালিত এদের ভদ্রতা ও শিষ্টাচার। জাপানের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এই ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখা যায়। এদিক থেকে চীনাদের সঙ্গে এদের অনেক পার্থক্য। দৈনন্দিন জীবনে এদের পালনীয় রীতিগুলি দেখলে অবাক হতে হয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চা পান এবং অতিথিদের চা খাওয়ানোর এক বিশেষ রীতি ও প্রথা। এইসব দৈনন্দিন ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের রীতিনীতি নিয়েই গড়ে উঠেছিল জাপানী শিভ্যালরি। জাপানী ভাষায় এই শিষ্টাচারের নামই বুশিডো। এই ধরনের শিষ্টাচার ও ভদ্রতা আজও জাপানে প্রচলিত রয়েছে। জাপানের সামুরাইগণ প্রভুর প্রতি অত্যন্ত অনুগত থাকত। তাহারা মৃত্যুকে ভয় করত না।

অনুশীলনী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। বিষয়মুখী

(ক) জাপানের আর এক নাম কি?

(খ) ফ্রান্সিস জেভিয়ার কে ছিলেন?

(গ) মিকাডো কাকে বলা হয়?

(ঘ) জাপানের ধর্ম কি ছিল?

(ঙ) দায়মিয়ো কাদের বলা হত?

(চ) শোগান কাদের বলা হত?

(ছ) সামুরাই কারা?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

(ক) মধ্যযুগে জাপানের রাষ্ট্রকাঠামো কি রকম ছিল?

(খ) জাপানের সঙ্গে বহিঃপৃথিবীর যোগাযোগ কখন নিষিদ্ধ হয়?

(গ) জাপানী সমাজ কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? সংক্ষেপে সমাজব্যবস্থার পরিচয় দাও।

(ঘ) জাপানী সম্রাট মিকাডো সম্বন্ধে কি জান?

৩। রচনাত্মক

(ক) মধ্যযুগে জাপানের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) শোগানদের হাতে ক্ষমতা কিভাবে কুক্ষিগত হয়?

(গ) তাদের ক্ষমতা ও রাজত্ব সংক্ষেপে লেখ।

(ঘ) জাপানে বৌদ্ধধর্ম কিভাবে প্রসার লাভ করে?

(ঙ) জাপানের দৈনন্দিন জীবনের শিষ্টাচারগুলি সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

(১১) মধ্যযুগে ভারত

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত বংশের পরে (৫ম-৭ম শতাব্দী) ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে হূন আক্রমণঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে রোম সাম্রাজ্যের যখন পতন ঘটে ভারতে তখন গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকাল। গুপ্ত সম্রাটদের আমলে গোটা আর্যাবর্ত অর্থাৎ উত্তর ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়। শান্তি, শৃঙ্খলা, সুশাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিল্পকলা সর্বদিক থেকে ভারতে দেখা যায় এক চরম সমৃদ্ধি। এইজন্য গুপ্তযুগকে বলা হয় 'ভারতের সুবর্ণ যুগ'। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের পর থেকে নানান কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার সুযোগে হূন নামে এক জাতি ভারত আক্রমণ করে। হূনদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটরা হূন আক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ হলেও এই আক্রমণের ধাক্কা সামলানো তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

হূনদের কথা প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। অ্যাটিলার নেতৃত্বে এই হূনরাই রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। হূনরা ছিল মধ্য এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। প্রায় দুশো খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে প্রাকৃতিক কারণে হূনরা মধ্য এশিয়া থেকে চীনের দিকে অগ্রসর হয় ও চীন আক্রমণ করে। এই সময় চীনে রাজত্ব করতেন শী হুয়াং তি নামে এক শক্তিশালী রাজা। হূন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তিনি চীনের পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—এই তিন দিক ঘিরে এক বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করেন। চীনের প্রাচীরে বাধা পেয়ে হূনরা পশ্চিম ও

দক্ষিণে অগ্রসর হয়। হূনদের চাপে মধ্য এশিয়ার শক নামে আর এক জাতি ভারত আক্রমণ করে। এরপর হূনরা দুদলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয় এবং রোম সাম্রাজ্যে হানা দেয়। অন্যদল কাস্পিয়ান অঞ্চল থেকে ধাওয়া করে ভারতের দিকে। এই দলই ইতিহাসে 'শ্বেত হূন' নামে পরিচিত।

হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা ভারত আক্রমণ করে ও প্রবেশ করে গন্ধার দেশে। অতঃপর পারস্য ও কাবুল দখল করে এবং কাশ্মীর জয় করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বিশাল অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

ভারতের হূনদের দুই বিখ্যাত নেতা ছিলেন তোরমান ও মিহিরকুল। কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও রাজপুতানা এবং উত্তর ও মধ্য প্রদেশের এক বিশাল অংশ জুড়ে তোরমান গড়ে তোলেন তাঁর রাজ্য। তোরমানের ছেলে মিহিরকুল পাঞ্জাব দখল করেন ও শাকল বা শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন করেন। মিহিরকুল ছিলেন বর্বর ও নৃশংস। ঐতিহাসিক কহ্লন ও চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ এঁরা দুজনেই মিহিরকুলের অত্যাচারের কাহিনীর কথা লিখে গিয়েছেন। সম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে হূনরা পুনরায় ভারত আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত অশেষ বীরত্বের সঙ্গে হূনদের পরাজিত করেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর বেশ কিছুকাল হূন আক্রমণ স্থগিত থাকে। কিন্তু মিহিরকুলের নেতৃত্বে হূনরা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গুপ্ত সাম্রাজ্য তখন প্রায় ভেঙে পড়েছে। অবশেষে গুপ্তবংশীয় নরসিংহ বালাদিত্য নামে এক রাজার হাতে হূনরা পরাজিত হয়। এই সময় গুপ্তসাম্রাজ্য নামেমাত্র টিকে ছিল। মুমূর্ষু গুপ্তদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল যশোধর্মন নামে মান্দাশোরের জনৈক রাজা। যশোধর্মন মিহিরকুলকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন (৫২৮ খ্রীঃ)। এর পর ভারতে হূনদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। যদিও ছোট ছোট হূন দলপতিরা ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও মালবে আরো কিছুকাল টিকেছিল।

হূনদের ঐতিহাসিক গুরুত্বঃ ইতিহাসে হূনদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। হূন আক্রমণের দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের বিশেষভাবে নজরে পড়ে। প্রথমতঃ, হূনদের আক্রমণ ছিল ব্যাপক—প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়ে। চীন, ভারত, পারস্য থেকে ইউরোপ পর্যন্ত তাদের ছিল অবাধ গতি। এই হূন আক্রমণের চাপেই রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, গুপ্ত রাজাদের কাছে প্রবল বাধা পাওয়ার ফলেই রোম সাম্রাজ্যের ওপর এদের আক্রমণের চাপ এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনঃ হূন আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত ধ্বসে পড়ে। সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর মাথা তুলে দাঁড়ায় অসংখ্য ছোট ছোট খন্ড রাজ্য। একশত বছর ধরে এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই ছিল। গুপ্ত রাজাদের আমলে ভারত যে রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করে সেই ঐক্যও বিনষ্ট হয়। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার ওপর হূনরা বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। হূন রাজারা অনেকেই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং কালক্রমে ভারতীয়দের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। পরবর্তী কালে ভারতে যে রাজপুত জাতির উৎপত্তি হয় অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় ও হূনদের সংমিশ্রণে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের যুগঃ হূন আক্রমণের পর থেকে পরবর্তী একশত বৎসর ভারতে যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও অরাজকতা চলছিল সম্রাট হর্ষবর্ধনের আবির্ভাবে সেই অনৈক্য ও অরাজকতা দূর হয়। সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়ে হর্ষবর্ধন এক বিশালসাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

হর্ষবর্ধন ছিলেন থানেশ্বরের পুষ্যভুতি বংশীয় সম্রাট প্রভাকর-বর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন। প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে বিবাহ হয় মৌখরীর রাজা গ্রহবর্মার। কিন্তু মালবরাজ দেবগুপ্তের চক্রান্তে গ্রহবর্মা নিহত হন এবং রাজ্যশ্রী কনৌজে বন্দী হন।

রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাজ্যবর্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্কের হাতে নিহত হলেন। কনৌজ ও থানেশ্বর এই দুই রাজ্যের সিংহাসন শূন্য হয়ে পড়ে। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন এই দুই রাজ্যের রাজা হন। ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রী পালিয়ে যান কনৌজের কারাগার থেকে। রাজ্যশ্রীর খোঁজে হর্ষবর্ধন এসে উপস্থিত হন বিন্ধ্য পর্বতে। রাজ্যশ্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। এরপর হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শশাঙ্ককে পরাজিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।



হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন ছিলেন একজন দানশীল রাজা। প্রতি পাঁচ বছর পর পর প্রয়াগে এক ধর্মোৎসব অনুষ্ঠিত হত। ভারতের নানান স্থান থেকে অসংখ্য ধার্মিক ব্যক্তি এই উৎসবে যোগ দিতেন। হর্ষবর্ধন ছিলেন ধর্মে শৈব। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন; অতএব প্রয়াগের উৎসবে বুদ্ধ ও শিব উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হত। এই উৎসবে হর্ষবর্ধন তাঁর সর্বস্ব দান করতেন। এমনকি তার পরার এক টুকরো কাপড় পর্যন্ত। রাজধানী কনৌজে হর্ষবর্ধন এক ধর্মসম্মেলন আহবান করেন। ভারতের বহু পন্ডিত এই সম্মেলনে যোগ দেন। বুদ্ধের এক সোনার মূর্তি তৈরি করে জাঁকজমক সহকারে বের করা হত এক বিশাল শোভাযাত্রা। শুধু

দানশীল আর ধর্মানুরাগী নয়, বিদ্যানুরাগের জন্যও হর্ষবর্ধন ছিলেন বিখ্যাত। 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামে তিনখানা নাটক তিনি নিজে রচনা করেন। তাঁর সভাকবি বানভট্ট লেখেন 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী'।

উত্তরাপথের রাজনৈতিক ঐক্যঃ হর্ষবর্ধন এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সেই সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল কেবল উত্তরাপথে অর্থাৎ আর্যাবর্তে। বিভিন্ন সূত্র থেকে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে হর্ষের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত। আর উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত। দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। দক্ষিণ ভারত জয় করতে গিয়ে তিনি ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজিত হন। পুলকেশীর লিপিতে তাই হর্ষবর্ধনকে 'সকলোত্তরা পথনাথ' বা সমগ্র উত্তরাপথের একচ্ছত্র অধিপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্তঃ হর্ষবর্ধনেব রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ। সুদূর চীন থেকে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কিভাবে তিনি ভারতে আসেন সে কথা দশম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। হিউয়েন সাঙ প্রায় চৌদ্দ বৎসর ভারতে ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বুদ্ধের পবিত্র বাণী সংগ্রহ ছিল তাঁর ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য। ভারতে এসেই হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। হর্ষবর্ধন কনৌজে যে ধর্মসভা আহ্বান করেন হিউয়েন সাঙ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রয়াগের মেলাতেও তিনি গিয়েছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে আমরা ভারতের তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি। হূন আক্রমণের

ফলে সে সময়ে অনেক শহর ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু গড়ে উঠেছিলো অনেক নতুন শহর, যেমন কনৌজ, প্রয়াগ, নালন্দা, থানেশ্বর, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, আর্যাবর্তের প্রধান শহর ছিল কনৌজ। হর্ষের রাজধানী প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

নাগরিকরা ছিল ধনী ও বিত্তশালী। তারা দামী দামী পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার পরত। ব্যবসা-বাণিজ্য চলত নানান দেশ-বিদেশের সঙ্গে যেমন আফগানিস্তান, চীন, সিংহল ও পূর্ব এশিয়া।

প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত। রাজস্বের হার ছিল খুব



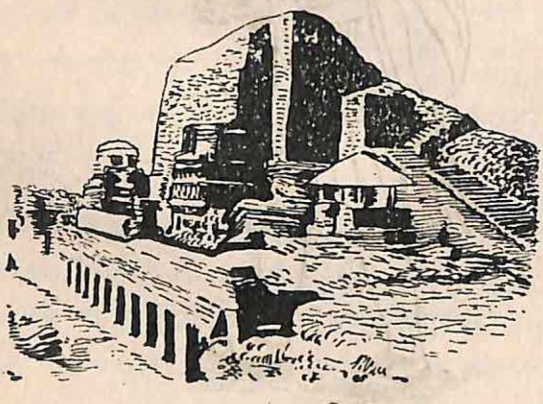
হিউয়েন সাঙ

কম। অপরাধীর জন্য ছিল কঠোর শাস্তি। কিন্তু এসত্ত্বেও দেশে চুরি-ডাকাতি প্রায় লেগেই ছিল। হিউয়েন সাঙ নিজে বেশ কয়েক বার দস্যু হাতে লাঞ্ছিত হন। কিন্তু প্রজাদের উপর যাতে কোনো অত্যাচার না হয় সম্রাটের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সম্রাট স্বয়ং প্রজাদের অবস্থার খোঁজখবর করতেন।

হিউয়েন সাঙ ভারতীয়দের চরিত্রের অনেক প্রশংসা করেছেন।

তাদের জীবনযাত্রা ছিল খুব সরল। তাঁরা ছিলেন সৎ, সত্যবাদী ও অতিথিপরায়ণ। সমাজে জাতিভেদ প্রথা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। চণ্ডাল, জেলে এরা ছিল অস্পৃশ্য। এরা বাস করত শহর ও গ্রামের বাইরে। উচ্চ জাতের লোকেরা এদের এড়িয়ে চলত এবং এদের ছায়াও মাড়াত না। মানুষে মানুষে এই ভেদাভেদের ফল পরবর্তী কালে ভারতকে ভোগ করতে হয়েছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ হিউয়েন সাঙের বিবরণীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল নালন্দা। নালন্দা শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল গুপ্ত রাজাদের আমলে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। প্রাচীন ভারতে এতবড় শিক্ষাকেন্দ্র আর দেখা যায় না। দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় দশ হাজার ছাত্র এখানে এসে নানা বিষয়ে পড়াশোনা করত। এই



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আবাসিক। ছাত্র ও অধ্যাপকরা এখানে একসঙ্গে থাকতেন। কোন ছাত্রকে বেতন দিতে হত না। রাজা ও ধনী লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চলত। হিউয়েন সাঙ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বৎসর ছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে আমরা নালন্দা সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি লিখেছেন

যে নালন্দায় শিক্ষার মান ছিল খুব উঁচু। কেবলমাত্র মেধাবী ছাত্ররাই তাই এখানে পড়ার সুযোগ পেত। অনেককেই ফিরতে হত হতাশ হয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল অত্যন্ত কঠোর। ছাত্রদের এই কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলতে হত। সুদূর চীন. পারস্য. মধ্য এশিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে বহু মনীষী এখানে এসে সমবেত হতেন. এবং নানান বিষয়ে পড়াশোনা ও আলাপ-আলোচনা করতেন। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো খুব মধুর। বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। কিছুকাল পূর্বে বিহার প্রদেশে পাটনার কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী**

(ক) ভারতে হুন আক্রমণ কত সালে ঘটেছিল ?

(খ) ভারতে হুন আক্রমণের দুই বিখ্যাত নেতার নাম কর

(গ) সম্রাট হর্ষবর্ধন কোন বংশের এবং কোথাকার রাজা ?

(ঘ) রাজ্যশ্রী কে ? কার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল ?

(ঙ) রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা নাটক দুটি কার রচনা ?

(চ) নালন্দা কি জন্যে বিখ্যাত ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

(ক) হুনরা কোথা থেকে কিভাবে ভারতে আসে ? হুনদের কোন দল ভারতে এসেছিল ?

(খ) মিহিরকুল কোন কোন ভারতীয় রাজার হাতে পরাজিত হন ?

(গ) গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যে কিভাবে চিড় খায় ?

(ঘ) রাজ্যশ্রীকে কে কিভাবে উদ্ধার করেন ? উদ্ধার করতে গিয়ে রাজ্যবর্ধনের কি ঘটেছিল ?

(ঙ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ্ কি বলেছেন ?

৩। **রচনাত্মক**

(ক) ভারতে হুন আক্রমণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) ভারতে হুন আক্রমণের গুরুত্ব কি ?

(গ) সম্রাট হর্ষবর্ধনের দানশীলতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

হর্ষোত্তর যুগ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব ও রাজপুত জাতিঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সব রাজ্যের অধিপতিদের অধিকাংশই নিজেদের রাজপুত বলে দাবি করে। 'রাজপুত' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত রাজপুত্র থেকে। রাজপুতরা নিজেদের চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেন। ঐতিহাসিক টড রাজপুত জাতিকে শক বংশোদ্ভূত বলে মনে করেন। কিন্তু কেবল শকরা নয়, বহিরাগত বিভিন্ন বিদেশী জাতি ও ভারতীয়দের সংমিশ্রণের ফলেই রাজপুত জাতির উদ্ভব হয়। রাজপুত জাতিদের মধ্যে গুর্জর প্রতিহারদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে রাজস্থান, গুজরাট, মালব এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের আরও কয়েকটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রাজপুতরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ভারত-ইতিহাসে এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। রাজপুতদের সমাজ ও অর্থনীতির গঠন প্রধানত ছিল সামন্ততান্ত্রিক।

কয়েকটি সামন্ততান্ত্রিক রাজপুতকুল বা রাজবংশঃ গুর্জর প্রতিহাররা নিজেদের রাজপুত বলে মনে করত। রাজপুতকুলগুলির মধ্যে এরাই প্রথম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গুর্জর প্রতিহারদের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা প্রথম নাগভট। প্রথম নাগভটের আমলেই গুর্জর প্রতিহারদের উত্থান শুরু হয়। মালব অঞ্চলে এরা বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। এই বংশের আরও দুই বিখ্যাত রাজা হলেন দ্বিতীয় নাগভট ও ভোজ মহেন্দ্র পাল। ভোজের রাজত্বকালে কনৌজে প্রতিহারদের রাজধানী স্থাপিত হয়। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ কর্তৃক কনৌজ ধ্বংসের পর প্রতিহারদের পতন ঘটে।

গুর্জর প্রতিহার ছাড়া এই সময় আরও যে কয়টি রাজপুত বংশের উদ্ভব ঘটেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চৌহান, চান্দেল্ল, কলচুরি, গাহোড়বাল, পরমার ও চৌলুক্য। রাজপুতজাতির ইতিহাসে

চৌহানদের নাম বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথমে এরা ছিল গুর্জর প্রতিহারদের সামন্ত। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে এরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ভারতের ইতিহাসে এরা এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় ভারতে মুসলমান আক্রমণ ঘটে। একাদশ শতকের শেষভাগে মুসলমানদের সেনাপতি মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে এই চৌহান বংশেরই বীর রাজা পৃথ্বীরাজের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু একতার অভাবে পৃথ্বীরাজ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেও পরাজিত হন। চান্দেল্ল বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজার নাম ধঙ্গ। ধঙ্গ কালঞ্জর ও গোয়ালিয়র জয় করেন। পরবর্তী কালে চান্দেল্লদের সঙ্গেও মুসলমানদের সংঘর্ষ ঘটে। ত্রয়োদশ শতকে এই বংশের গৌরব লুপ্ত হয়। কলচুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কোক্কল। কিন্তু তাঁর বংশধর লক্ষ্মীকর্ণ এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি কলিঙ্গের গঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। কিন্তু বাংলার পাল রাজাদের হাতে তিনি পরাজিত হন। গাহোড়বালদের রাজ্য গড়ে উঠেছিল কনৌজ ও বারাণসীকে কেন্দ্র করে। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হলেন গোবিন্দ চন্দ্র। তাঁর পৌত্রের নাম জয়চন্দ্র। কিন্তু জয়চন্দ্রও মহম্মদ ঘোরীর হাতে পরাজিত হন। গুজরাট অঞ্চলে ছিল পরমারদের আধিপত্য। রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর প্রতিহার বংশের পতনের পর পরমাররা মালবে এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে। শোলাঙ্কী ও চৌলুক্য বংশ গড়ে ওঠেছিল গুজরাট কাথিয়াবাড় অঞ্চলে। এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন প্রথম ভীম। কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণকে পরাজিত করেন। কিন্তু মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করা চালুক্যদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্বঃ হর্ষের মৃত্যুর পর কনৌজের অধিকার নিয়ে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট, মালবের গুর্জর প্রতিহার বংশ ও বাংলার পালরাজাদের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম শুরু হয়। প্রতিহাররাজ প্রথম ও দ্বিতীয় নাগভট উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূট রাজাদের হাতে তাঁরা পরাজিত

হন। দ্বিতীয় নাগভট পালবংশের রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেন। তিনি চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করে কনৌজে আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু গোবিন্দের নিকট দ্বিতীয় নাগভট পরাজিত হন। ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় নাগভাটের পৌত্র মিহিরভোজ পাঞ্জাব থেকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত অধিকার স্থাপন করেন। মিহিরভোজের পৌত্র মহেন্দ্রপালের আমলে কনৌজের গৌরব বৃদ্ধি পায়।

ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনে ব্যর্থতাঃ কিন্তু ভারতের কোন রাজবংশই এ সময় সমগ্র ভারত জুড়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয় নি। মহেন্দ্র পালের পর থেকে প্রতিহার বংশের পতন শুরু হয়। যদিও প্রতিহাররা মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু মহেন্দ্র পালের মৃত্যুর পর থেকেই প্রতিহার সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ছোট ছোট রাজ্যগুলি হয়ে পড়ে বড় রাজ্যগুলির তাঁবেদার। ভারতের এই রাজনৈতিক অনৈক্য ও দুর্বলতার সুযোগে মুসলমানরা ভারত আক্রমণ ও জয় করে। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী

(ক) 'রাজপুত' শব্দটির কিভাবে উৎপত্তি হয় ?

(খ) দ্বিতীয় নাগভট কে ?

(গ) পৃথ্বীরাজ কোন বংশের রাজা ছিলেন ?

(ঘ) কলচুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি ?

(ঙ) ধর্মপাল কোন রাজার হাতে পরাজিত হন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

(ক) তিনটি রাজপুত বংশের নাম কর।

(খ) মহম্মদ ঘোরী কে ? তাঁর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের সংঘর্ষ সংক্ষেপে লেখ।

৩। রচনাত্মক

(ক) রাজপুত জাতির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) পাল-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকুট দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মধ্যযুগে বাংলা

শশাঙ্ক ঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে একজন স্বাধীন ও সার্বভৌম পরাক্রান্ত রাজার কথা আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি। এই সার্বভৌম রাজাই হলেন গৌড়ের অধিপতি ইতিহাস-বিখ্যাত মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ নগরে। তাঁর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ কিছুকাল পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের সংঘর্ষের কথা হর্ষবর্ধন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। শশাঙ্ক ছিলেন গৌড় বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম নরপতি। তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে বারাণসী ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঞ্জাম থেকে একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কের জনৈক সামন্ত এই তাম্রশাসন লিখেছিলেন। মেদিনীপুরের আরও দুটি তাম্রশাসনে শশাঙ্ককে চতুর্জলধিবেষ্টিত পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ শশাঙ্কের আগে বাংলার আর কোন রাজা এত বিশাল সাম্রাজ্য আর গড়ে তুলতে পারেন নি।

বানভট্টের হর্ষচরিত ও হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আমরা শশাঙ্ক সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি। হিউয়েন সাঙের মতে শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী। হিউয়েন সাঙ নিজেই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। সুতরাং হিউয়েন সাঙের এই মত যে নিরপেক্ষ তা বলা যায় না। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে হিউয়েন সাঙ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরে আসেন এবং এই নগরে বৌদ্ধ ধর্ম ও বিহারগুলির যে যথেষ্ট সমৃদ্ধি আছে তা উল্লেখ করেন। বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হলে কোনমতেই এ-কাজ শশাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হত না।

পাল ও সেন যুগে সমাজ ও সাধারণ জীবনঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে বাংলাদেশে অরাজকতা দেখা দেয়। এই অরাজকতাকেই বলে মাৎস্যন্যায়। অবশেষে বাংলার সাধারণ মানুষেরা গোপাল নামে জনৈক ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করে এই মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটায়। গোপালের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশই ইতিহাসে পাল বংশ নামে বিখ্যাত। পাল বংশের পরবর্তী দুই বিখ্যাত রাজা ছিলেন ধর্মপাল ও দেবপাল। পালবংশের পর বাংলার সিংহাসনে বসেন সেন রাজবংশ। সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিজয় সেন। পরবর্তী দুই উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন; এই লক্ষ্মণ সেনের আমলেই মুসলমানরা বাংলা জয় করেন। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস থেকে আমরা বাংলার পাল ও সেন যুগের সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি।

বাঙালীদের অধিকাংশই বাস করত গ্রামে। তাদের জীবন ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। তাদের প্রধান জীবিকা ছিল চাষবাস। ধনী ও অভিজাতরা বাস করতেন শহরে। নাগরিকদের জীবন ছিল বিলাসবহুল। পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল খুব সাধারণ। পুরুষেরা পরত আটপৌরে খাটো মাপের ধুতি, মেয়েরা পরত শাড়ি। মেয়েরা নানা ছাঁদে চুল বাঁধত। মেয়ে-পুরুষ উভয়েই পরত নানান ধরনের অলংকার। প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ-মাংস, শাকসবজি, দুধ ও ঘি। সে সময়ে ইলিশ মাছ খাওয়ার চল ছিল। দুর্গোৎসব ছিল বাংলার প্রধান উৎসব। এছাড়া আরও নানান ধরনের পাল-পার্বণ ছিল। ছিল হোলি, চড়কপূজা ও অন্নপ্রাশন। পাশা ও দাবা খেলার বিশেষ চল ছিল। শিকার, মল্লযুদ্ধ ও ব্যায়ামের চর্চা এবং নাচ-গানও চলত।

ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কৃতিঃ পাল রাজারা ছিলেন ধর্মে বৌদ্ধ। অতএব তাঁদের আমলে বাংলা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র। এই সময় পূর্ব ভারতে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার। নালন্দায় সমৃদ্ধি তখনও ছিল। কিন্তু পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে

আরও কয়েকটি নতুন বৌদ্ধ বিহার। এদের মধ্যে বিক্রমশীলা ও উদন্তপুর বিহারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুটি বিহারই গড়ে উঠেছিল ধর্মপালের আমলে। এছাড়া সোমপুরি নামেও একটি বৌদ্ধ বিহার তিনি স্থাপন করেন। বর্তমান বাংলাদেশে পাহাড়পুরে এর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

পাল ও সেন যুগে বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতিরও বিশেষ উন্নতি হয়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এই সময় রচনা করেন চর্যাপদ। চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এই সময় বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। এদের মধ্যে কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতকাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যে পালরাজা রামপাল ও কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেনদের আমলেও সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট বিকাশ দেখা যায়। কাব্য ও সাহিত্য রচনায় সেন রাজাদের ছিল অফুরন্ত উৎসাহ। বল্লাল সেন দুখানি কাব্য রচনা করেন। এই দুই কাব্যের নাম 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর'। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন কবি ধোয়ি-উমাপতিধর ও জয়দেব প্রমুখ কবি। ধোয়ি কালিদাসের মেঘদূত অনুকরণে রচনা করেন 'পবনদূত'। লক্ষ্মণ সেন ছিলেন এই কাব্যের নায়ক। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব। 'গীত গোবিন্দ' রচনার জন্য তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে এই কাব্য রচিত হয়েছে। মেঘদূতের পর এমন মধুর কাব্য ভারতে আর লেখা হয়নি।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী

(ক) বাংলার প্রথম সার্বভৌম রাজা কে?

(খ) হর্ষচরিত কার রচনা?

(গ) 'মাৎস্যন্যায়' কাকে বলে?

২। উত্তরভিত্তিক ও রচনাত্মক

(ক) রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

(খ) বাংলায় কখন মাৎস্যন্যায় দেখা দেয়? কিভাবে এর অবসান ঘটে?

(গ) পাল ও সেনযুগে বাংলার সমাজজীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ ভারত

বাতাপির চালুক্য বংশঃ উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ-ভারতেও কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এইসব রাজ্যগুলি ছিল স্বাধীন। এই রাজ্যগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল বাতাপির চালুক্য বংশ। চালুক্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পুলকেশী। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত বাতাপি বা বাদামিতে পুলকেশী চালুক্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পুত্র কীর্তিবর্মণ এবং উত্তর কঙ্কণ থেকে বেলারি ও কুর্নুল জেলা অধিকার করেন। ৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাই মঙ্গোলেশ। মঙ্গোলেশ রত্নাগিরি জেলা এবং উত্তর দাক্ষিণাত্যের কলচুরিদের হারিয়ে দিয়ে তাদের রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে নিহত হন।

দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি প্রথমে মহীশূরের গঙ্গবংশীয় রাজাদের এবং উত্তর কঙ্কণের মৌর্যদের পরাজিত করে তাদের রাজ্য অধিকার করেন। মালব ও গুজরাটের রাজারা অতঃপর তার বশ্যতা স্বীকার করেন। এরপর তিনি পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণকে যুদ্ধে হারিয়ে দেন। এই সময় থেকেই শুরু হয় চালুক্য ও পহ্লবদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের আধিপত্য নিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব। কেরল, চোল ও পাণ্ড্যরাজারা তার আনুগত্য স্বীকার করে। সম্রাট হর্ষবর্ধনও তার হাতে পরাজিত হন এবং তাঁর দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এইভাবে পুলকেশী এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। অবশেষে কাঞ্চীর এক পহ্লবরাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। পুলকেশীর মৃত্যুর পর থেকে চালুক্য রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তার পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পহ্লবদের পরাজিত করে এই বংশের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করেন। ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকুটরাজ দন্তিদুর্গ পহ্লবরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণকে পরাজিত করে বাতাপির চালুক্য বংশের অবসান ঘটান।

চালুক্যস্থাপত্য ও শিল্প : চালুক্য রাজারা ছিলেন শিল্পানুরাগী। কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এরা বৌদ্ধরীতি অনুসরণ করেন। চালুক্যদের আমলে



দক্ষিণ ভারতের মন্দির (তাঞ্জোর)

অজন্তা গুহায় বহু চিত্র অঙ্কিত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপাসনার জন্য এরা বাতাপি ও অন্যত্র অনেক বড় বড় মন্দির নির্মাণ করেন। চালুক্য রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ভারত চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ উন্নত হয়।

কাঞ্চীর পহ্লব বংশ : দক্ষিণ ভারতের আর একটি উল্লেখযোগ্য রাজবংশ পহ্লব। পহ্লব বংশের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কাঞ্চীকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে পহ্লব বংশের উদ্ভব ঘটে। শিবস্কন্দবর্মণ এই বংশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পহ্লবরাজ বিষ্ণুগোপকে যুদ্ধে হারিয়ে দেন। এরপর প্রায় দুশো বছর পহ্লবদের ইতিহাস সঠিক জানা যায় না। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধে সিংহবিষ্ণু নামে এক রাজার আমলে পহ্লবরা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সিংহবিষ্ণু চোল চের পান্ড্য ও সিংহলের রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে দেন এবং কাবেরী নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে তিনি পরাজিত হন এবং তাঁকে বেঙ্গী প্রদেশ ছেড়ে

দিতে হয়। কিন্তু তাঁর পুত্র নরসিংহবর্মণের হাতে দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত হন· এবং বাতাপি অধিকৃত হয়। ফলে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে পহ্লবদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহলে তিনি দুটি নৌ-অভিযান পাঠান। তাঁর রাজত্বকালেই হিউয়েন সাঙ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে আসেন। অতঃপর পহ্লব বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। নরসিংহবর্মণের আমলেই মহাবলীপুরমের বিখ্যাত রথ নির্মিত হয়। চালুক্য ও পহ্লবদের সুদীর্ঘ বিরোধের সুযোগে রাষ্ট্রকুটবংশ দাক্ষিণাত্যে নিজেদের অধিকার বিস্তার করে।

পহ্লব শিল্প ও স্থাপত্যঃ পহ্লবরা ছিলেন সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাই পহ্লবযুগে একদিকে যেমন সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি ভাস্কর্য শিল্পেরও বিকাশ ঘটে। পাথর কেটে মন্দির তৈরির রীতি পহ্লবদের আমলেই শুরু হয়। পহ্লবরাজ নরসিংহবর্মণ মহাবলীপুরমে এই ধরনের মন্দির নির্মাণ করেন। মহাবলীপুরমে যেসব মন্দির ও মূর্তি নির্মিত হয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বনে পাথর কেটে রথ আকারের মন্দির তৈরি করা হয়। দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের আমলে নির্মিত হয় কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির।

চোল নৌশক্তিঃ দক্ষিণ ভারতের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রাজবংশ চোল। সোমদের পতনের পর চোলেরা সুদূর দক্ষিণে চোল নায়ক কারিকল সুদূর দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে নিয়ে চোল শক্তি গড়ে তোলেন। পহ্লবদের অভ্যুদয়ে চোলদের অগ্রগতি বাধা পায়। নবম শতকে পহ্লব শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে এই দুর্বলতার সুযোগে চোলেরা আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। কাবেরী নদী পর্যন্ত চোল রাজ্য বিস্তৃত হয়। চোলরাজ প্রথম পরান্তক (৯০৭-৯৫৪) সিংহল অভিযান করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের হাতে পরাজিত হন। এই সময় তাঞ্জোর ছিল চোলদের রাজধানী।

৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে চোলদের রাজা হন রাজরাজ। এই সময় থেকেই চোলদের ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। রাজরাজ প্রতিবেশী অঞ্চলগুলি জয় করেন। বেঙ্গীর চালুক্যরাও তাঁর হাতে পরাজিত হন। তিনি এক শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করেন এবং এই নৌ-বাহিনীর সাহায্যে সিংহল ও ভারত মহাসাগরে কয়েকটি দ্বীপ জয় করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল (১০১৬ খ্রীষ্টাব্দ)। কল্যাণের চালুক্য এবং মহীশূরের গঙ্গ বংশকে পরাজিত করে রাজেন্দ্র চোল গোটা দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য স্থাপন করেন। কলিঙ্গ, উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ বাংলা জয় করেন এবং গঙ্গোইকোণ্ড বা 'গঙ্গাতীর বিজয়ী' উপাধি ধারণ করেন। তাঁর আমলেও চোল নৌ-বাহিনী বিশেষ শক্তিশালী ছিল। এই নৌ-বাহিনীর সাহায্যে তিনি সিংহল, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও পেগু জয় করেন। এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যবদ্বীপে শৈলেন্দ্র নামে এক রাজবংশ একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলে। রাজেন্দ্র চোলের অজেয় নৌ-বাহিনীর এবার নজর পড়ল এই রাজ্যটির ওপর। বিশাল নৌ-বাহিনী নিয়ে তিনি শৈলেন্দ্র রাজ্যটি দখল করলেন। তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হল এবং শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের এক বিশাল অংশ তিনি অধিকার করলেন। কিন্তু এই দূরবর্তী রাজ্যটি দখলে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রায় দীর্ঘ এক শতাব্দী সংগ্রামের পর শৈলেন্দ্ররা চোল অধীনতা থেকে মুক্ত হয়। রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর থেকে চোল শক্তির অবনতি ঘটে এবং ত্রয়োদশ শতকে চোল সাম্রাজ্য একটি স্থানীয় রাজ্যে পরিণত হয়।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী**

(ক) চালুক্যবংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কি?

(খ) বিষ্ণুগোপ কে?

(গ) সিংহবিষ্ণু কে?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও রচনাত্মক**

(ক) দ্বিতীয় পুলকেশী সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

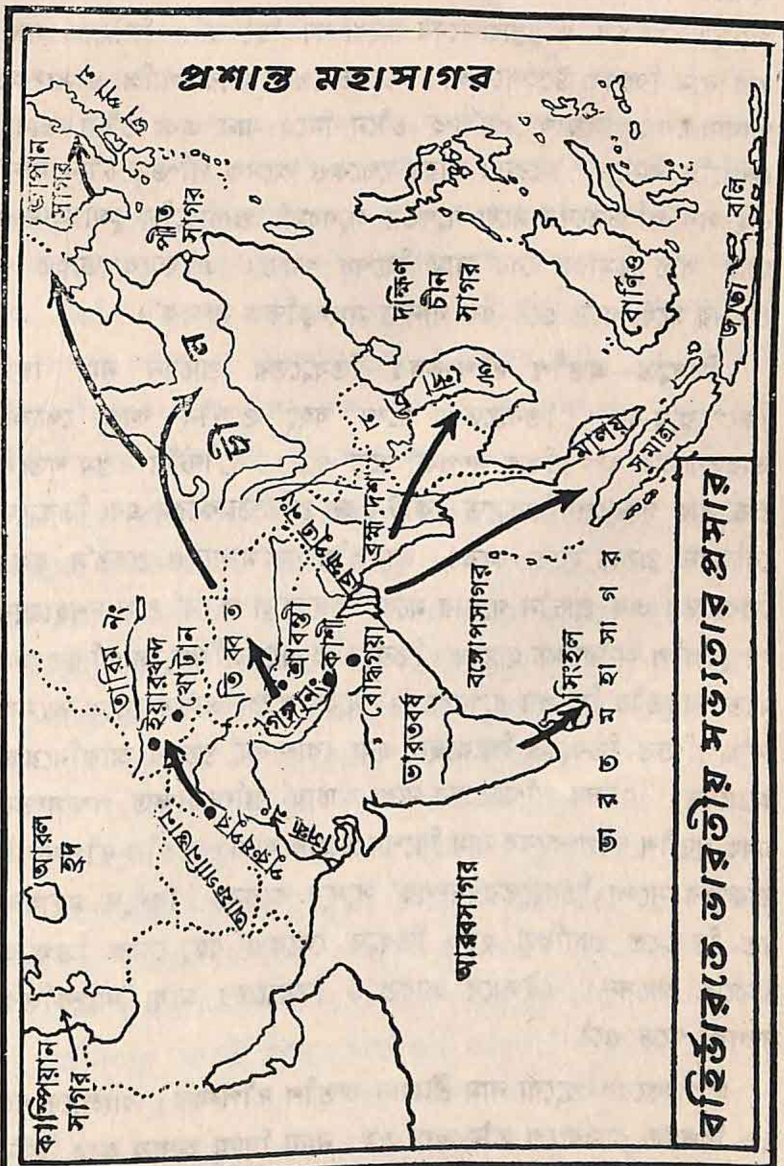
(খ) চালুক্য ও পহ্লবদের স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় দাও।

১২ ভারতের সঙ্গে বৈদেশিক যোগাযোগ

খুব প্রাচীনকাল থেকেই নানান দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। মূলত এই যোগাযোগ ছিল পশ্চিম জগতের সঙ্গে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে তখন গড়ে উঠেছিল অনেক সমৃদ্ধ বন্দর। এইসব বন্দর থেকে পশ্চিম জগতের নানান স্থানে ভারতীয় জাহাজের আনাগোনা চলত। মণিমুক্তো, রত্ন, গন্ধদ্রব্য ও মসলিন ছিল প্রধান বাণিজ্য। বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রধানত গড়ে উঠেছিল রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে। এই বাণিজ্য চলত মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর হয়ে। স্থলপথেও ভারতের বাণিজ্য চলত কেবল পশ্চিম জগতের সঙ্গে নয়, চীন ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গেও।

মধ্য এশিয়াঃ মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন বেশ কিছুকাল হল আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই ভারতীয় সভ্যতা মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করে। মহাযন বৌদ্ধধর্ম এখানে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছিল। অসংখ্য বৌদ্ধ জনপদ ও ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন এতকাল চাপা পড়েছিল মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমির বালুরাশির মধ্যে। মনীষী অরেলস্টাইন এই ধ্বংসাবশেষের বেশ কিছু স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। মরুভূমির বালুর নীচে থেকে পাওয়া গেছে মঠ, মন্দির, মূর্তি, স্তূপ ও অসংখ্য ভারতীয় নিদর্শন। এছাড়া খোটান প্রভৃতি শহর। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে খোটানের ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ দেখা যায়।

চীনঃ চীনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে। অনেকে মনে করেন এই সময়েই ভারত থেকে বৌদ্ধ প্রচারকরা চীনে গিয়েছিলেন। কশ্যপ মাতঙ্গ নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু সর্বপ্রথম চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে। বৌদ্ধধর্ম চীনের ইতিহাসকে



বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার

গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। চীন থেকে বহু পরিব্রাজক ও ভিক্ষু ভারতে এসেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্যে। এইসব পরিব্রাজকদের মধ্যে ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত থেকে তাঁরা পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ চীনে নিয়ে যান এবং চীনা ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করেন। ভারত থেকেও অনেক পণ্ডিত চীনে যান। এই সব পণ্ডিতদের মধ্যে গুণভদ্র, গুণবর্মা, প্রজ্ঞারুচি, কুমারযান ও তাঁর পুত্র কুমারজীবের নাম বিশেষ খ্যাত। এইভাবে ভারত ও চীনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক।

তিব্বত—অতীশ দীপঙ্করঃ তিব্বতের প্রাচীন নাম ছিল কিংপুরুষ-বর্ষ। তিব্বতের সঙ্গে বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে স্রঙ্ সাঙ গাম্‌পো তিব্বতে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। ভারতীয় বর্ণমালারও প্রবর্তন হয়। তিব্বতের এক প্রাচীন গুহার মধ্যে কিছুকাল পূর্বে প্রায় দশহাজার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তিব্বতীয় এই লিপিগুলি পণ্ডিতদের মতে ভারতীয় লিপির রূপান্তর। যুগে যুগে ভারত থেকে অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতে গিয়েছেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এইসব পণ্ডিতদের মধ্যে আচার্য শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব এবং অতীশ দীপঙ্করের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতীশ দীপঙ্করই ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক সুদৃঢ় করেন। বিশুদ্ধ মহাযান মত তিব্বতে প্রচারিত হয়। তিব্বত থেকেও বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভারতে আসেন। এইভাবে ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

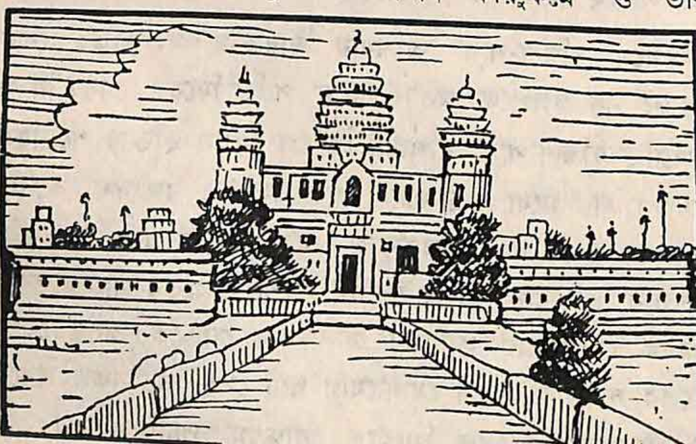
দীপঙ্করের পুরো নাম শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর। বাংলাদেশের এক বিখ্যাত রাজবংশে তাঁর জন্ম হয়। নানা বিদ্যা আয়ত্ত করে তিনি উদণ্ডপুর বিহারের আচার্য শীল রক্ষিতের কাছে দীক্ষা নেন এবং তাঁর উপাধি হয় শ্রীজ্ঞান। এরপর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিদ্যা শিক্ষার জন্য

সুবর্ণ দ্বীপে যান। সেখানে বারো বৎসর নানান শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যান সিংহলে। অতঃপর দেশে ফিরে আসেন এবং বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রধান আচার্যের পদ লাভ করেন। এই সময়ে তিব্বতের রাজা বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দীপঙ্কর প্রথমে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুকাল পরে তিব্বতের রাজা এক শত্রুর হাতে বন্দী ও নিহত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুনরায় দীপঙ্করকে তিব্বত যাবার জন্য এক করুণ আবেদন জানান। এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা দীপঙ্করের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। এবারে তিনি তিব্বত অভিযান করেন। তিব্বতের রাজধানীতে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হয়। দীপঙ্কর প্রায় তের বৎসর তিব্বতে ছিলেন এবং দুশো খানা ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতিঃ কেবল স্থলপথেই নয় জলপথে অর্থাৎ সমুদ্র পাড়ি দিয়েও ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিংহল, ব্রহ্মদেশ, কম্বোজ, চম্পা, মালয় উপদ্বীপ ও সুবর্ণভূমি অর্থাৎ সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এইসব দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ কাহিনী জানা যায় জাতকের গল্প থেকে। সিংহলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটে সেই প্রাচীনকাল থেকে। সম্রাট অশোকের আমলে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। ব্রহ্ম দেশেও বহু আগেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরো কয়েকটি স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এখানে গড়ে ওঠে কয়েকটি ভারতীয় রাজ্য। প্রাচীন লিপি থেকে এইসব রাজ্যের ইতিহাস জানা যায়। এই রাজ্যগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল কম্বোজ, মালয় উপদ্বীপ ও জাভা বা যবদ্বীপ। কম্বোজে ভারতীয় রাজ্য গড়ে ওঠে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে মেকং নদীর ধারে। এই রাজ্যই ফুনান নামে পরিচিত। শোনা

যায়. কৌণ্ডিল্য নামে জনৈক ভারতীয় রাজপুত্র স্থানীয় এক রাজকুমারীকে বিবাহ করে এই রাজ্যটি গড়ে তোলেন। চীনের একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে প্রায় এক হাজারেরও ওপর ভারতীয় এই রাজ্যে বাস করত। কম্বোজ রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে। সেকালের এই কম্বোজই বর্তমানে কাম্বোডিয়া নামে পরিচিত।

কম্বোজের রাজধানী ছিল যশোধরপুর নগরে। এই যশোধরপুরই পরবর্তী কালে আঙ্কোরথোম নামে পরিচিত হয়। চীনের এক বিবরণ থেকে এই নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই নগর ছিল চতুষ্কোণ। চারপাশে উঁচু প্রাচীর ও গভীর পরিখা। এই নগরীতে ছিল বড় বড় প্রবেশদ্বার। রাস্তাঘাট বেশ চওড়া। অসংখ্য সুন্দর প্রাসাদ বা অট্টালিকা নানান কারুকর্মে ও ভাস্কর্যে



আঙ্কোরভাট বিষ্ণুমন্দির

সুশোভিত। এছাড়া ছিল সরোবর ও মনোরম উদ্যান। রাজপথগুলি ছিল জনসমাকীর্ণ। অভিজাত ও ধনীরা চলাফেরা করতেন রথে কিংবা হাতিতে। নগরের মাঝখানে ছিল আকাশ-ছোঁয়া বিশাল মন্দির। তিনতলে বিভক্ত এই মন্দির ছিল চল্লিশ চূড়ার—এর চারপাশে ছিল আরো অনেক প্রাসাদ ও মন্দির। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল আঙ্কোরভাট। এক বিশাল চত্বরের মধ্যে মন্দিরটি

অবস্হিত ছিল। চত্বর ঘিরে ছিল আকাশ-ছোঁয়া উঁচ্ পাথরের প্রাচীর ও পরিখা। পরিখার ওপরে প্রবেশদ্বার। প্রবেশদ্বারের ওপর চওড়া সেতু। মন্দিরটি ছিল অসংখ্য তলে বিভক্ত। প্রতিটি তলে প্রশস্ত অলিন্দ। মন্দিরের দেওয়াল জ্বড়ে চোখজ্বড়ানো ছবি ও ভাস্কর্য। আঙেকারভাট ছিল ২১৩ ফ্বট উঁচ্. ⅔ মাইল লম্বা এবং আধমাইল চওড়া। আঙেকারভাটের এই মন্দিরই বিষ্ণ্মন্দির নামে পরিচিত এবং ভারতীয় শিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন।

মালয়, জাভা, বরব্দর ঃ মালয় উপদ্বীপ, জাভা, স্বমাত্রা, বলি এই সব দ্বীপেও ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দ্বীপগ্বলিই প্রাচীন কালে স্ববর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল। স্ববর্ণভূমি ছিল ধনরত্নের আকর। বিশেষ করে এই অঞ্চল নানান মশলাপাতির জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রায় বিপদসংকুল সমুদ্র পেরিয়ে ভারতীয়রা এইসব দেশে উপনিবেশ গড়ে তোলে। উপনিবেশ স্হাপনের সঙেগ সঙেগ দক্ষিণ-প্বর্ব এশিয়ার এই সব দেশের সঙেগ ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে শৈলেন্দ্র নামে এক রাজবংশ স্বমাত্রার শ্রীবিজয়ে একটি রাজ্য গড়ে তোলে। শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন ভারতীয় সভ্যতায় অন্বপ্রাণিত। সপ্তম শতকে মালয়, জাভা, বোর্নিয়ো ও বলিদ্বীপ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে প্বর্ব ভারতীয় দ্বীপপ্বঞ্জে শৈলেন্দ্র রাজাদের আধিপত্য স্হাপিত হয়। ভারত ও চীন দেশের সঙেগ শৈলেন্দ্র রাজগণের ক্বটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কোন রাজাদের সঙেগ সংঘর্ষে কিভাবে শৈলেন্দ্র রাজবংশের পতন ঘটে সেকথা প্বর্বে বলা হয়েছে। অষ্টম শতকের শেষে শৈলেন্দ্র রাজারা বাংলাদেশের বৌদ্ধ দার্শনিক কুমার ঘোষকে তাঁদের ধর্মগ্বর্ হিসাবে বরণ করেন। তাঁর প্রভাবে শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্বরাগী হয়ে পড়েন। শৈলেন্দ্ররাজ বাল প্বত্রদেব পাল-সম্রাট দেবপালের রাজত্বকালে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীবিজয় রাজ্যে বহ্

বৌদ্ধমঠ ও বিহার নির্মিত হয়। এদের গঠনশৈলীতে ভারতীয় স্থাপত্যরীতির প্রভাব দেখা যায়। শৈলেন্দ্র রাজাদের শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যবদ্বীপের বরবুদর স্তূপ—স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে। নয়টি তলে ইহা উন্নীত। প্রথম ছয়টি তল সমচতুষ্কোণ। উপরের তিনটি গোলাকার। ওপরের তলে উঠবার জন্য চারপাশে রয়েছে প্রশস্ত সোপান। এই স্তূপের অভ্যন্তরে রয়েছে ৪৩২টি অপরূপ বুদ্ধমূর্তি। দেওয়ালে মনোরম ভাস্কর্য—বুদ্ধের জীবন-ইতিহাস ও বৌদ্ধধর্মের কিংবদন্তী নিয়ে রচিত। ওপরের তিনটি তলে তিন সারি ছোট ছোট স্তূপ। প্রত্যেকটি স্তূপের মধ্যে একটি করে বুদ্ধমূর্তি। এই স্তূপকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য ব'লে গণ্য



বরবুদর মন্দির

করা যায়। বরবুদর স্তূপের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই মহাকাব্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কয়েকটি মন্দিরগাত্রে রামায়ণের কাহিনী উৎকীর্ণ করা হয়। যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে ওয়াং বা ছায়াভিনয় ছিল খুব জনপ্রিয়। এই ছায়াভিনয় রচিত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের বড় বড় বীরদের কীর্তিকলাপ নিয়ে। নবম শতকে যবদ্বীপ শৈলেন্দ্রদের হস্তচ্যুত হয়। একাদশ শতকে চোলেদের আক্রমণে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী

(ক) প্রথম কোন দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ?

(খ) মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কে আবিষ্কার করেন ?

(গ) অতীশ দীপঙ্কর কে ? তাঁর পুরো নাম কি ? তিব্বতের প্রাচীন নাম কি ?

(ঘ) কৌণ্ডিল্য কে ?

(ঙ) বরবুদর কি ? কোথায় ছিল ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক

(ক) মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি কিভাবে উদ্ধার হয় ?

(খ) ভারতের কোন কোন বৌদ্ধপণ্ডিত চীনে গিয়েছিলেন ? কেন ?

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ? কখন ও কিভাবে ?

(ঙ) আঙ্কোরথোমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। রচনাত্মক

(ক) মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় দাও।

(খ) চীনের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সংক্ষেপে লেখ।

(গ) শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ঘ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংক্ষেপে লেখ।

(ঙ) আঙ্কোরভাট ও বরবুদর মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৩ ভারতে সুলতানী শাসন

ভারতে তুর্ক আফগান শক্তির আগমনঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে ভারতে প্রথম মুসলমানদের অভিযান হয়। মুসলমানদের ধর্মের নাম ইসলাম। আরব দেশে হজরত মহম্মদ কিভাবে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করেন সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে। ভারতে মুসলমান অভিযানের নেতা ছিল আরবরা। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন দাহির। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজ মহম্মদ বিন কাশেম নামে তাঁর এক সেনাপতিকে ভারত অভিযানে পাঠান। মহম্মদ বিন কাশেম সিন্ধুদেশ অধিকার করেন। দাহির পরাজিত ও নিহত হয়। কিন্তু এই অভিযান প্রায় দুশো বছর সিন্ধু দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে আরব অভিযানের বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি।

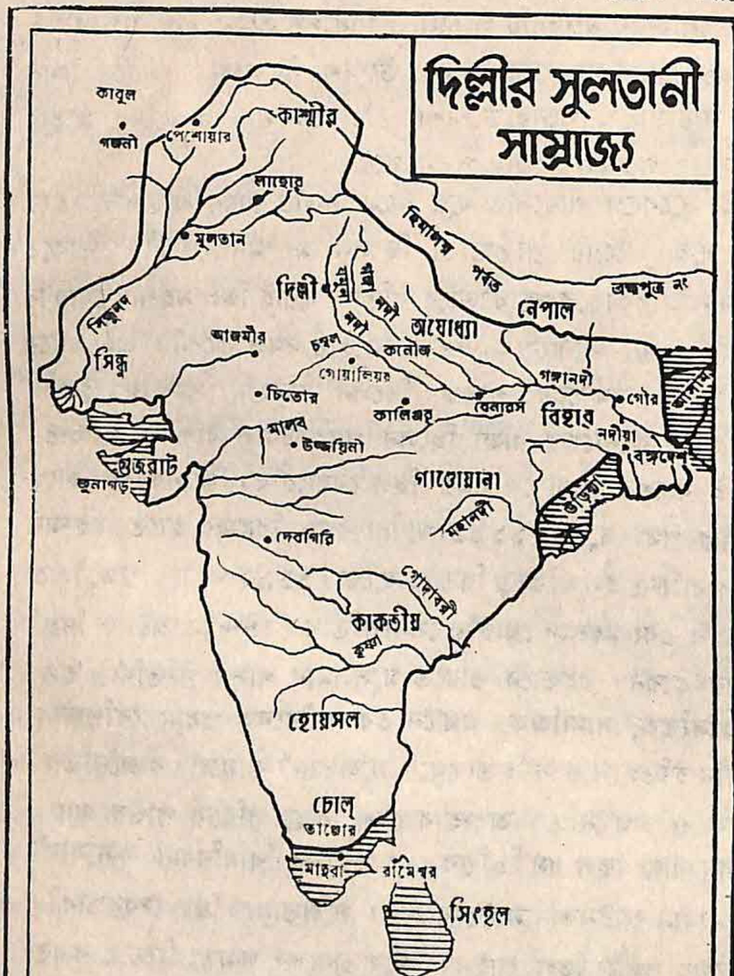
খ্রীষ্টীয় দশম শতকে আফগানিস্তানে গজনী নামে একটি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যের শাসকরা ছিলেন তুর্ক আফগান বংশীয়। গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান সবুক্তগীন। গজনী রাজ্যের পূর্বদিকে ছিল উদভান্ডপুর নামে একটি ছোট রাজ্য। শাহী বংশীয় হিন্দু রাজা জয়পাল ছিলেন সেই রাজ্যের রাজা। সবুক্তগীনের সঙ্গে জয়পালের এক প্রবল সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে জয়পাল পরাজিত হন। ইতিমধ্যে সবুক্তগীনের মৃত্যু ঘটে। তাঁর পুত্র মামুদ বসেন গজনীর সিংহাসনে। সুলতান মামুদ ছিলেন তাঁর পিতা অপেক্ষাও শক্তিশালী। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মামুদ প্রায় ১৭ বার ভারত অভিযান করেন। তাঁর অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অপরিমিত ধনরত্ন লুণ্ঠন। ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে জয়পাল মামুদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়পালের পুত্র আনন্দপালকে পরাজিত করার পর মামুদ প্রায় প্রতি বছরই ভারত অভিযান করেন। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ আক্রমণ করেন ও মথুরার মন্দির লুণ্ঠিত হয়।

কিন্তু সোমনাথ অভিযানই তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিযান। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের রাজা প্রথম ভীমদেবকে পরাজিত করে মামুদ বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরটি লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করেন এবং অপরিমিত ধনলুণ্ঠনই ছিল মামুদের একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। ভারতে কোন স্হায়ী সাম্রাজ্য স্হাপনের উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। মামুদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গজনী রাজ্যের পতন ঘটে।

এই সুযোগে পারস্যের ঘুর নামে একটি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঘুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহম্মদ ঘোরী। ভারতে মুসলমান অধিকারকে স্হায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মহম্মদ ঘোরীর উদ্দেশ্য। ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাহোর দখল করেন। এই সময়ে দিল্লী ও আজমীরের শাসক ছিলেন চৌহান বংশীয় তৃতীয় পৃথ্বীরাজ। কনৌজের রাজা ছিলেন গাহোড়বাল বংশীয় জয়চ্চন্দ্র। এই দুই বংশের মধ্যে সে সময় ছিল রেষারেষি। থানেশ্বরের কাছে তরাইয়ের প্রথম যুদ্ধ (১১৯১ খ্রীঃ) পৃথ্বীরাজের হাতে মহম্মদ ঘোরী পরাজিত হন। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীঃ) পৃথ্বীরাজ নিহত হন এবং মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতবউদ্দীন অইবক দিল্লী অধিকার করেন। এইভাবে ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ তৎকালীন ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে সুলতানী আমলের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্হার বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান রাষ্ট্র ছিল ধর্মভিত্তিক। কোরানের বিধিবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের নানান আইনকানুন তৈরি হত। সুলতানরা ছিল স্বৈরাচারী। তাঁর মুখের কথাই ছিল আইন। সুলতানদের ক্ষমতা নির্ভর করত সামরিক শক্তির ওপর। সুলতান ছিলেন প্রধান বিচারক, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান আইন-প্রণেতা। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী। যদিও অধঃস্তন অসংখ্য রাজকর্মচারী ছিল, কিন্তু তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা নির্ভর করত সুলতানদের মর্জির উপর। কোনরকম বাধ্যবাধকতা ছিল না।

সমাজ ছিল অভিজাত, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমজীবী—এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত। সমাজে ধন-ঐশ্বর্যের অধিকাংশ ভোগ করতেন



সুলতান ও অভিজাত সম্প্রদায়। মধ্যবিত্ত ও গরিবদের বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। অভিজাতেরা বাস করতেন বিলাস-ব্যসনের মধ্যে। কিন্তু মধ্যবিত্ত আর কৃষক ও শ্রমজীবীদের জীবন যাপনের মান ছিল অনুন্নত। নারীরা ছিল পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল।

হিন্দু-মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল। হিন্দু সমাজে সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। মুসলমানদের মধ্যে ছিল ক্রীতদাস প্রথা।

কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল প্রধান উপজীবিকা। শ্রমশিল্পও ছিল। উৎপাদন-ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়। কৃষক ও শ্রমিকরা তাদের শ্রমের উপযুক্ত মজুরি পেত না। করভার ছিল অত্যধিক। দরিদ্রকে শোষণ করে সুলতান ও তার আমীর ওম্‌রাহরা বিলাস-ব্যসনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। আমীর খসরু লিখেছেন রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তো ছিল শোষিত দরিদ্র শ্রেণীর রক্তবিন্দুর এককেটি দানা।

সমন্বয়ঃ প্রাচীনকালে গ্রীক হূন প্রভৃতি যেসব জাতি ভারতে এসেছিল তারা কালক্রমে এদেশের জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল. কিন্তু দীর্ঘকাল ভারতে বাস করেও মুসলমানেরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে তারা নিজেদের মিলিয়ে ফেলতে পারেনি। এর কারণ ইসলামের তৎকালীন অন্তর্নিহিত শক্তি। গোড়ার দিকে তাই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এদের ছিল বিরূপ মনোভাব। হিন্দুদের মুসলমানরা কাফের নামে অভিহিত করত। হিন্দুরাও গোড়ায় ইসলাম ধর্মকে সহ্য করতে পারেনি। শাসকদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অন্যান্য কারণে ইসলামের প্রভাব থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে হিন্দুসমাজ তাই বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। হিন্দুরা বরাবরই রক্ষণশীল। মুসলমানদেরও তাই তারা অভিহিত করেন যবন নামে। হিন্দু ও মুসলমানদের রেষারেষির প্রধান কারণ এই দুই ধর্মের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য। ইসলাম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু হিন্দুরা পৌত্তলিক—তারা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি পূজা করে। এছাড়া আরো বহু পার্থক্য ছিল। সুতরাং হিন্দু ধর্মকে রক্ষার জন্য এই সময় অনেক ভারতীয় রক্ষণশীল মনীষী এগিয়ে আসেন। এঁদের

মধ্যে বাংলার রঘুনন্দন ও বিজয়নগরের মাধবাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রক্ষণশীল মনোভাব দুই সম্প্রদায়ের মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

কিন্তু দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে ক্রমে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে এবং বিরোধের অবসান হয়। দুই সম্প্রদায়েই পরস্পর পরস্পরকে বোঝবার চেষ্টা করে। সত্যপীরের পূজার প্রচলন হয়। কিন্তু এই মিলনের প্রয়াস যে কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও ক্রমেই এটা পরিস্ফুট হয়। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়।

ভক্তিবাদ (মধ্যযুগের সাধুসন্ত)ঃ এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসেন কয়েকজন মুসলমান ও হিন্দু সাধুসন্ত বা ধর্ম-সংস্কারক। মুসলমান ধর্মসংস্কারকদের বলা হত সুফী। এই সুফীদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন নিজামুদ্দীন আউলিয়া ও মইনুদ্দীন চিস্তী। হিন্দু সাধুসন্তরা ভক্তিবাদী নামে পরিচিত। তাঁদের প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় ভক্তিবাদ। মানুষে মানুষে মিলন, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভক্তি, প্রেম ও শ্রদ্ধাই ছিল এই ধর্মের মূলবাণী। ভক্তিবাদীদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর।

শ্রীচৈতন্যঃ বাংলাদেশে ভক্তিবাদ প্রচার করেন শ্রীচৈতন্য। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর বাণী ভক্তিতে মুক্তি ও সর্ব জীবে প্রেম। তিনি জাতি, বর্ণ ও ধর্মভেদ মানতেন না। তাঁর আমলে বাংলাদেশে ভক্তি ও প্রেমধর্মের প্লাবন বয়ে যায়। বাংলার সুলতান হুসেন শাহের কর্মচারী রূপ ও সনাতন এবং যবন হরিদাস ছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য। তিনি নীলাচলে দেহ রক্ষা করেন। তাঁর

ধর্ম বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।



শ্রীচৈতন্য

নানকঃ ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম হয়। সত্যের সন্ধানে তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেন। এমনকি সুদূর মক্কায় যান। তাঁর ধর্মেরও মূল কথা ছিল মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা। নানক শিখ নামে একটি নতুন ধর্ম প্রচার করেন। শিখ শব্দের অর্থ শিষ্য। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকেই তিনি শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করতেন।



কবীর



নানক

কবীরঃ কবীর ছিলেন রামানন্দের শিষ্য। কিন্তু তিনি কোন

জাতির লোক ছিলেন তা সঠিক বলা যায় না। কেউ বলেন তিনি ব্রাহ্মণ, আবার কেউ বলেন মুসলমান জোলা। মানুষে মানুষে পার্থক্য কবীরও মানতেন না। ঈশ্বর ও আল্লা এক—এই ছিল তাঁর বাণী। তিনি ছোট ছোট হিন্দি শ্লোকের মধ্যে দিয়ে তাঁর উপদেশ প্রচার করতেন। এগুলিকে বলা হয় দোঁহা। তিনি বলতেন আল্লা ও রাম একই ঈশ্বরের দুই নাম। এইভাবে সুফী ও ভক্তিবাদী ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান ধর্ম ও সমাজের মধ্যে বিভেদ দূর হয় এবং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের পথ সুগম হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় ধর্ম প্রচার করায় দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যেরও উন্নতি হয়।

শিল্প-সাহিত্যঃ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুলতানী যুগে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। হিন্দু ও মুসলমান শিল্প-রীতির সংমিশ্রণে এক নতুন শিল্পরীতি গড়ে ওঠে। এই শিল্পরীতি ইন্দো-স্যারাসেনীয় শিল্পরীতি নামে পরিচিত। ভারতে এসে গোড়ার দিকে মুসলমান শাসক ও বিজেতারা নির্বিচারে ভারতীয় শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন মন্দির ইত্যাদি ধ্বংস করেছেন এবং সেই ধ্বংসের ওপর গড়ে তুলেছেন মসজিদ, সমাধি সৌধ বা কোন বিজয়স্তম্ভ। গম্বুজ ও মিনার মুসলমান স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতে গম্বুজ ও মিনার ছিল না। বৌদ্ধ স্তুপগুলির আকৃতি কিছুটা গম্বুজের মতো। হিন্দু শিল্পীরা মুসলমান সুলতানদের নির্দেশে যেসব গম্বুজ ও মিনার তৈরি করেছেন তাতে পড়েছে ভারতীয় প্রভাব। এছাড়া রয়েছে অলংকরণ। সুলতানী যুগে দিল্লী ও ভারতের অন্যত্র অসংখ্য স্থাপত্যশিল্প গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কুতুবমিনার, আলাই-দরওয়াজা, নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধি মন্দির এবং সুলতান ফিরুজ শাহের সমাধি সৌধ।

সুলতানী যুগে সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি ঘটে। এই সময় সংস্কৃতের কদর হ্রাস পায় ও তার বদলে আরবী, ফারসী ও বিভিন্ন

আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমীর খসরু ছিলেন ফারসী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনাতেও এই সময় উৎসাহ দেখা যায়। এ যুগের দুই বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীন ও জিয়াউদ্দীন বরনী। মিনহাজ উদ্দীন লিখেছেন তবকত-ই-নাসিরি, জিয়াউদ্দীন লিখেছেন তারিখ-ই-ফিরুজশাহী। এ যুগের আর এক বিখ্যাত মনীষী অল বিরুনী। তাঁর রচিত তারিখ-ই-হিন্দ থেকে সেকালের অনেক কথা জানা যায়। এসময় হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যেরও অনেক উন্নতি হয়। হিন্দী ও ফারসী ভাষা মিশিয়ে উর্দু নামে এক সুন্দর ভাষার উদ্ভব হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যেরও বিকাশ দেখা যায়। নানান প্রদেশে বিশেষত বাংলায় রামায়ণ-মহাভারতের মতো বিখ্যাত মহাকাব্য ও ধ্রুপদী সাহিত্যগুলিরও বেশ কিছু অনুবাদ হয়।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী**

(ক) ভারতের মুসলমান অভিযানের নেতা কে ছিলেন ?

(খ) সুলতান মামুদ কে ?

(গ) মহম্মদ ঘোরী কে ? তিনি কোন যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজতি করেন ?

(ঘ) ভক্তিবাদ কাকে বলে ? শ্রীচৈতন্য কে ছিলেন ?

(ঙ) নানক ও কবীর কে ?

(চ) সুলতানী যুগের দুজন ঐতিহাসিকের নাম কর।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

(ক) সুলতান মামুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন ? তাঁর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

(খ) তরাইনের যুদ্ধ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(গ) সুলতানী যুদ্ধে ভারতের সমাজজীবন কিরকম ছিল ?

(ঘ) নানক ও কবীরের জীবনী সংক্ষেপে লেখ।

৩। **রচনাত্মক**

(ক) সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ সংক্ষেপে লেখ।

(খ) সুলতানী আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতানী যুগে বাংলা—ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের আমলে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে গৌড়ের সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে ইখতিয়ার উদ্দীন নামে এক মুসলমান সেনাপতি বাংলাদেশ জয় করেন এবং বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গোড়ার দিকে দিল্লীর সুলতানরা বাংলাদেশকে তাদের সাম্রাজ্যের অধীনে আনবার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের এই চেষ্টা সফল হয়নি। বাংলায় প্রায়ই বিদ্রোহ ঘটে এবং বাংলাদেশের শাসকরা কার্যত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ইলিয়াস শাহ, সিকন্দর শাহ এবং হুসেন শাহ। এদের আমলে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট রূপান্তর দেখা দেয়। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা দেয় বাংলা হয়ে ওঠে তার কেন্দ্র। হুসেন শাহের রাজত্বকালেই শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে তাঁর ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। এর প্রভাব উভয় ধর্মকে ছাপিয়ে সমাজজীবনেও প্রতিফলিত হয়। হুসেন শাহ ছিলেন এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। ফলে বাংলায় জাতিভেদের কঠোরতা অনেক হ্রাস পায় এবং মানুষে মানুষে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু হিন্দু সমাজ ছিল তখনও রক্ষণশীল। সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। নানান শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধও হিন্দুদের মেনে চলতে হত। নারীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। তাদের বেশির ভাগই গৃহকাজে রত থাকত। নানান পালপার্বণের চল তখনও ছিল। মুসলমানরা রোজা রাখত, কোরান পড়ত আর পীরের দরজায় সিরনি দিত। হিন্দুরাও সত্যপীরের পূজা করত। পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারেও এই দুই সমাজের মধ্যে আদান-প্রদান চলে। সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন। হুসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ ছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। মালাধর বসু বাংলায় ভাগবত রচনা

করে হুসেন শাহের কাছ থেকে গুণরাজ খাঁ উপাধি পান। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর প্রেরণায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচনা করেন বাংলা মহাভারত। পরাগল খাঁর ছেলে ছুটি খাঁর নির্দেশে মহাভারতের একটি পর্বের বাংলা অনুবাদ হয়। সংস্কৃত শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও চলতে থাকে। নবদ্বীপ ছিল এই শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য গড়ে ওঠে অনেক টোল ও চতুষ্পাঠী। কৃষিই বাংলার প্রধান উপজীবিকা। কিন্তু কৃষকদের অবস্থা ভাল ছিল না। তারা নানানভাবে শোষিত হত। কৃষি ছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যেরও বিকাশ ঘটে। বাংলার প্রধান শিল্প মসলিন বস্ত্র এই সময় বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। দিল্লীর সুলতান থেকে আমীর ওমরাহেরা পর্যন্ত এই মসলিন ব্যবহার করত। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু এবং কয়েকজন বিদেশী পর্যটক বাংলার মসলিন শিল্পের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এই সময় বাংলায় বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। সপ্তগ্রাম ছিল বিখ্যাত বন্দর। সমসাময়িক বাংলার নানান কাব্য ও সাহিত্যে এই বাণিজ্যের বর্ণনা রয়েছে। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। জিনিসপত্রের দাম ছিল খুব কম। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মান ততটা উন্নত ছিল না। কারণ আয় ছিল খুব কম। তবে অভাব-অভিযোগ বর্তমানের মতো এত তীব্র ছিল না।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী**

(ক) কোন মুসলমান সেনাপতি বাংলাদেশ জয় করেন ?

(খ) হুসেন শাহ কে ছিলেন ?

(গ) সতীদাহ প্রথা কাকে বলে ?

২। **উত্তরভিত্তিক ও রচনাত্মক**

(ক) হুসেন শাহের আমলে বাংলার সাংস্কৃতিক অবস্থা সংক্ষেপে লেখ।

(খ) সুলতানী যুগে বাংলার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতানী যুগে শাসনব্যবস্থা ঃ সুলতানী রাষ্ট্র ছিল ধর্মভিত্তিক। সুলতান ছিলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী। তাঁর মুখের কথাই ছিল আইন। তিনি ছিলেন একাধারে আইন-প্রণেতা, প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান বিচারপতি। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে কোরানের বাণী তাঁকে মেনে চলতে হত। সুলতানকে সাহায্য করার জন্য ছিল উজীর ও বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটি পরিষদ। সুলতান প্রয়োজনানুসারে এদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন কিন্তু এই পরামর্শ গ্রহণ করার কোন বাধ্যবাধকতা তাঁর ছিল না। উজীরের স্থান ছিল ঠিক সুলতানের পরেই। তাঁর অধঃস্তন বিভাগের কর্মচারীদের পরিচালনার ভার ছিল তাঁর ওপর।

কাজী ছিলেন প্রধান বিচারপতি। কোরানের বিধি অনুযায়ী তিনি বিচার করতেন। কিন্তু এ বিষয়ে সুলতান ছিলেন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। দন্ডবিধি ছিল খুব কঠোর। গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড দেওয়া হত। অপরাধীদের ওপর জোরজুলুমেরও অন্ত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীর অপরাধ প্রমাণের আগেই তাকে শাস্তি দেওয়া হত।

কোতোয়ালের কাজ ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। মুতাশিবদের ছিল পুলিসের কাজ। জনগণের গতিবিধির ওপর নজর রাখা এবং বাজারের দরদাম ও ওজনের দিকে নজর রাখাই ছিল এদের প্রধান কাজ। সুলতানের এক বিশাল গুপ্তচর বাহিনীও ছিল। এই বাহিনীর সাহায্যে সুলতান দেশের খবরাখবর সংগ্রহ করতেন। কিন্তু কারাগারের নিয়মকানুন ছিল শিথিল। কর্মচারীরাও দুর্নীতি-মুক্ত ছিল না।

ভূমিকর ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। এছাড়া ছিল আরও অন্যান্য কর ও শুল্ক। হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হত। পরিবর্তে তারা সুলতানের কাছ থেকে পেতেন জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার আশ্বাস, সামাজিক দায়দায়িত্বের হাত থেকে পেতেন অব্যাহতি। কারণ ধর্মীয় কারণে অ-মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হত না। অর্থে কিংবা পণ্যে এই দুই ভাবেই কর দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সুলতানদের মর্জিমাফিক রাজস্বনীতির অদলবদল ঘটত।

প্রত্যেক সুলতানেরই ছিল একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী। এই সেনাবাহিনীতে তুর্কী, পার্শী, ভারতীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মানুষ ছিল। পদাতিক, তীরন্দাজ, অশ্বারোহী ও হস্তী নিয়ে সেনাবাহিনী গঠিত ছিল। কিন্তু কামানের প্রচলন ছিল না।

রাজসভা ছিল জৌলুস ও জাঁকজমকের কেন্দ্র। অধিকাংশ সুলতানই ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে দিন কাটাত। সুলতানী আমলে এই শাসনব্যবস্থা ছিল প্রায় পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক।

অনুশীলনী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। কাজী ও কোতোয়ালের কাজ কি ছিল?
২। সুলতানী যুগে ভারতের শাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে লেখ।

১৪ মধ্যযুগের অবসান

(১৩শ ও ১৫শ শতক)

কনস্টানটিনোপলের পতন ও ইউরোপীয় নবজাগরণে তার গুরুত্ব ঃ ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্কীরা কনস্টানটিনোপল অধিকার করে। কনস্টানটিনোপলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ও মধ্যযুগের অবসান হয় বলে ধরে নেওয়া হয়। রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হলেও কনস্টানটিনোপল ছিল গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এই শহরে সমাবেশ ঘটেছিল বহু জ্ঞানী গুণী চিন্তাশীল মনীষীরা। তুর্কীরা কনস্টানটিনোপল অধিকার করলে এইসব মনীষী ইউরোপের নানান দেশে আশ্রয় নেন। কিন্তু বেশির ভাগই চলে আসেন ইতালিতে। কারণ ইতালিই ছিল সে সময় এঁদের মানসিক বিকাশের প্রধান কেন্দ্র। এই সময় থেকেই এঁদের গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি ঝোঁক ও কৌতূহল দেখা যায়। গ্রীস ও রোমের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে এঁরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মানুষের মনে জেগে উঠতে থাকে নানান প্রশ্ন। মধ্যযুগের ধর্মানুশাসনের পরিবর্তে মানুষ এখন ধর্ম ও জীবনের সব কিছু তার বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায় এক বিরাট পরিবর্তন। মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপের বৈষয়িক জগতে যে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, তার ছাপ পড়ে তাদের চিন্তাজগতেও। মানুষের চিন্তাজগতের এই বিরাট আলোড়ন ও প্রাচীন গ্রীক শিল্প-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার—সাধারণত এই দুই ঘটনার মধ্যে দিয়েই শুরু হয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। এই নবজাগরণ থেকেই ইতিহাসে

আধুনিক যুগের সূত্রপাত। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দকে তাই মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ—এই দুই যুগের সীমারেখা বলে ধরা হয়।

কিন্তু ইউরোপের মানুষের মনের এই ওলটপালট ও চিন্তা-জগতের এই আলোড়ন ও পরিবর্তন রাতারাতি ঘটে নি। ইউরোপের মানুষের মনে এই নবজাগরণের প্রস্তুতি চলছিল দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতক থেকেই। ইউরোপের বৈষয়িক জগতের কিছু পরিবর্তন ও প্রধানত ধর্মযুদ্ধ নবজাগরণের এই ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে তুলেছিল। ধর্মযুদ্ধ ছিল সামন্তপ্রথার অবসানের একটা মস্ত বড় কারণ। এই যুদ্ধে তহবিল ও টাকাকড়ি যুগিয়ে সামন্তপ্রভুরা ফতুর হয়ে গিয়েছিল। এদিকে যানবাহন যুগিয়ে ও প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করে ইতালির নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলি উঠেছিল টাকা-পয়সায় ফুলে ফেঁপে। সামন্তপ্রভু ও জমিদারদের স্থান দখল করেছিল ইতালির বড় বড় বণিক শিল্পপতিরা। এইভাবে ইতালিতে উদ্ভব ঘটেছিল এক নতুন বুর্জোয়া বা ধনিক শ্রেণীর। ইতালির এই ধনিক শ্রেণী ও মেদিচি প্রভৃতি ধনী পরিবারগুলিই ছিল শিল্প ও সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বিশিষ্ট মনীষী, শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা তাই এসে ভিড় জমিয়েছিলেন ইতালিতে। কারণ ইতালির শহরগুলি ছিল সে সময় বিশেষ সমৃদ্ধ। ইউরোপে এসময় আরো কয়েকটি সমৃদ্ধশালী শহর গড়ে ওঠে। যেমন ফ্রান্সের প্যারি, ইংলণ্ডের লণ্ডন, জার্মানীতে হ্যামবুর্গ, রাশিয়ায় নভগরদ এবং হল্যাণ্ডে এণ্টোয়ার্প। এই শহরগুলি ছিল বাণিজ্যপ্রধান। ইউরোপের নানান স্থান থেকে বহু লোক এইসব স্থানে এসে জড়ো হত ও নানান বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করত।

কিন্তু এদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল চার্চ ও বাইবেল। উদীয়মান ধনিক শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের মনে এখন চার্চ ও চার্চের ধর্মীয় অনুশীলন ও বাইবেল সম্পর্কে নানান প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। পোপ, ধর্মযাজক ও সামন্তদের বাঁধা জীবনের ছক ও সংকীর্ণ

দৃষ্টিভঙ্গী এখন এরা আর মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। ইহজীবনের ভোগসুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকেই তারা এখন বড় করে দেখতে থাকে। সুতরাং বাইবেলের বুলি ও পরলোকে স্বর্গসুখের আস্বাদকে এখন আর তারা একমাত্র বেদবাক্য বলে মনে করে না। বাইবেলের বাণী ও টীকাটিপ্পনীগুলিকে এখন তারা তাদের যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে চায় সেসব কতটা সত্যি। সুতরাং তাদের মনে গড়ে ওঠে এক প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিবাদ। বাইবেল এখন তারা নিজেরাই পড়তে চায়, প্রতিটি শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য জানতে চায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। চার্চের নির্দেশ ও ধর্মোপদেশের চেয়েও এদের কাছে এখন বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ—যেমন দেশ-বিদেশের খবরাখবর, জাহাজ নির্মাণ কিংবা রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও ভূগোল। সুতরাং এইসব বিষয় সম্পর্কে তারা কৌতূহলী হয়ে পড়ে ও এইসব বিদ্যাচর্চায় ক্রমেই আগ্রহী হয়ে ওঠে। জাগতিক সব কিছুই তারা এখন হাতে-কলমে কি নিজের চোখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে চায়। সত্যকে তারা যাচাই করতে চায় তাদের নিজেদের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে। রজার বেকন ছিলেন ঠিক এমনি একজন মনীষী।

তাদের সামনে সুযোগও এসে গেল। এই সময় ইউরোপে চালু হল কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র। কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র বহুকাল আগেই চীন দেশে আবিষ্কৃত হয়েছিল। চীনাদের কাছ থেকে ইউরোপ এর ব্যবহার শিখে নিল। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হওয়ায় মানুষের জ্ঞানের পরিধি গেল বেড়ে। এ পর্যন্ত বই হাতে নকল করা হত। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র ও ছাপাখানা চালু হওয়ার ফলে এখন খুব অল্প সময়ে অনেক অনেক বেশি বই ছাপা সম্ভব হল। ফলে বই পড়া এখন আর মুষ্টিমেয় কিছু ধনী ব্যক্তি বা যাজকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বই পড়ার রেওয়াজ চালু হয়ে গেল। প্রথম বাইবেল ছাপা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি সংখ্যায়। ফলে এবার সব মানুষই বাইবেল পড়ে নিজেদের বিচার-বিশ্লেষণী শক্তি দিয়ে

বাইবেলের সত্যাসত্যগুলিকে যাচাই করার সুবিধা পেল। সৌরজগৎ সম্পর্কে বাইবেলের বাঁধা বুলি ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। কোপার্নিকাস নামে জনৈক বিজ্ঞানী প্রমাণ করে দেখালেন পৃথিবী নয়, সূর্যই সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র। গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন টেলিস্কোপ দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

এর ফলে মানুষের চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটল। বুর্জোয়া মনীষী ও বুদ্ধিজীবীরা এই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নূতন-ভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণায় ঘটল আমূল পরিবর্তন। পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণা গেল বদলে। বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করলেন পৃথিবীটা গোল।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টজগৎকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করা হত। এই খ্রীষ্টজগতের প্রধান ছিলেন পোপ। পোপের মাধ্যমেই চার্চ বা গীর্জা মানুষের ধর্মীয় জীবন পরিচালনা করত। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছিল সম্রাটদের হাতে। কিন্তু মধ্যযুগের অবসানে এইসব ধারণা গেল চুরমার হয়ে। চার্চের ভেতরে নানান দুর্নীতি ও ব্যভিচার ঢুকে পড়ল। পোপ ও ধর্মযাজকদের ঘটল নৈতিক অবনতি। ফলে মানুষের নৈতিক জীবনে চার্চের সেই কর্তৃত্ব আর রইল না। ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ল। কারণ ধর্মকে ভাঙিয়ে চার্চ সাধারণ মানুষকে নানানভাবে শোষণ করছিল। 'ইনডালজেন্স' নামে এক ধরনের টিকিট বিক্রী শুরু হয়েছিল জার্মানীতে। মানুষকে বোঝানো হচ্ছিল এই টিকিট কিনলে ঈশ্বর মানুষকে তার সব পাপ থেকে মুক্তি দেবেন। ধর্মের নামে এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করলেন মার্টিন লুথার নামে জার্মানীর এক অধ্যাপক। এই প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েই ইউরোপে শুরু হল ধর্মসংস্কার আন্দোলন। এদিকে সম্রাটদের হাতেও আর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব রইল না। বর্বর জাতির আক্রমণে তাদের কর্তৃত্বে আগেই ভাটা পড়েছিল। মধ্যযুগীয় অরাজকতায় তাদের স্থান দখল করেছিল সামন্তপ্রভুরা। মধ্যযুগের অবসানে এই সামন্তপ্রভু ও ভূস্বামীদের ক্ষমতাও গেল লুপ্ত হয়ে। ধর্মযুদ্ধের ফলে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠায় ইউরোপের

মানুষের মনে গড়ে উঠল এক জাতীয় চেতনা। ফলে সামন্তযুগে ইউরোপের সমাজে যে শ্রেণীভেদ ছিল. সেই শ্রেণীভেদ গেল লুপ্ত হয়ে এবং তার পরিবর্তে গড়ে উঠল জাতীয়তাবাদ। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের বদলে ইউরোপের এক-এক দেশের মানুষ এখন থেকে তাদের এক-একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে ভাবতে শিখল। যেমন ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, ওলন্দাজ ইত্যাদি। ইউরোপের প্রতিটি জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইংল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শুরু হল জাতীয় সংগ্রাম। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসলেন নরম্যান অধিপতি উইলিয়ম দ্য কংকারার। দ্বাদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ইংল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপের নানান দেশে নানান জটিল রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটে। এদিকে রাজাদের স্বৈরাচার আর স্বেচ্ছাচারিতাও যায় বেড়ে। এই নিয়ে ইংল্যান্ডে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় এক জোর লড়াই। রাজাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহ করে।

কনস্টানটিনোপলের পতনের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় পথে আরব বণিকদের মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে প্রাচ্যের যে বাণিজ্য চলত তুর্কী আক্রমণে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং প্রয়োজন হয়ে পড়ল নতুন জলপথ আবিষ্কারের। ইতালিতে গড়ে ওঠা নতুন শহর এবং পর্তুগালের মতো দেশগুলিই এই আবিষ্কারের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। জাহাজনির্মাণ, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, মানচিত্র প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে সমুদ্রযাত্রা এবং নতুন নতুন দেশে ভৌগোলিক অভিযানের পথও অনেক সুগম হল। ১৪৯৮ খ্রী ভাস্কো-ডা-গামা আবিষ্কার করলেন ভারতে যাবার জলপথ। কলম্বাস আবিষ্কার করলেন আমেরিকা নামক নতুন মহাদেশ (১৪৯২)। ম্যাগেলান জাহাজে পাড়ি দিয়ে গোটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন। মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি গেল বেড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষেরা ছড়িয়ে পড়ল এশিয়া ও আফ্রিকার নানান দেশে। কালক্রমে এইসব দেশেই তারা গড়ে তুলল উপনিবেশ। এইসব উপনিবেশকে

কেন্দ্র করেই পরবর্তী কালে গড়ে উঠেছিল এশিয়া ও আফ্রিকার এক-এক দেশে ইউরোপের এক-এক দেশের সাম্রাজ্য। ভারতে এইভাবেই ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, ইউরোপে বুর্জোয়াদের হাতে অতিরিক্ত ধন ও পুঁজির ফলেই তাদের পক্ষে এইসব উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এইভাবে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নেয় ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ। আর এই পুঁজিবাদ থেকেই জন্ম হল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের। বর্তমানে অবশ্য সে সাম্রাজ্যবাদ আর নেই। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের উদ্ভবের ফলে গোটা পৃথিবীর ধ্যানধারণা পালটে যায়। কার্ল মার্কস নামে জনৈক জার্মান মনীষী এই সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা বর্তমান পৃথিবীর মননজগতে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী**

(ক) কত খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে?

(খ) কোন খ্রীষ্টাব্দকে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে ধরা হয়?

(গ) সামন্তপ্রথা অবসানের সবচেয়ে বড় কারণ কি?

(ঘ) মধ্যযুগের চারটি বিখ্যাত শহরের নাম কর।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক**

(ক) মধ্যযুগের শেষে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে কি পরিবর্তন দেখা যায়?

(খ) ইতালিতে কীভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে?

(গ) মনীষীরা কেন ইতালিতে এসে ভিড় জমিয়েছিল?

৩। **রচনাত্মক**

(ক) ইউরোপে নবজাগরণের সূত্রপাত কিভাবে হয়?

(খ) মধ্যযুগের শেষে মানুষের মনে আলোচনার প্রধান বিষয় কি ছিল এবং কেন?

(গ) কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের ফলে কি কি সুবিধে হয়েছিল?

মূল্য ঃ কের টাকা মাত্র